আলাপে প্রলাপে

শ্রীনগেন্দ্রনাথ মিত্র
(বিহার ও উড়িষ্যা সিভিল সার্‌ভিশ)

দাম একটাকা

প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র বি-এস-সি
১৮।এ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

প্রাপ্তিস্থান : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কুলজা সাহিত্য-মন্দির
১৫ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীশশধর ভট্টাচার্য্য
মাসপয়লা প্রেস
১৯।১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

ভূমিকা

বঙ্গভারতীর পবিত্র মন্দিরের পূজারী হবার সৌভাগ্য নেই, স্পর্দ্ধাও রাখিনা। শুধু ফুল, দূর্ব্বাদল আহরণ করবার আকাঙ্খায় অশান্ত, অবোধ বালকের মত জীবনের তরুণ সূর্য্যালোকে ও মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে ছুটোছুটি করেছি। দু চারটি ফুল, বিল্বপত্র যা সংগ্রহ করেছিলাম,—"মানসী মর্ম্মবাণী," "মুক্তি," "ঝরণা" প্রভৃতির সুযোগ্য সম্পাদক,—বাণীর অনুরাগী পূজারিগণের হস্তে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম। তাঁরা সে ফুল বা পত্র দেবীর কাছে উৎসর্গ করে পূজা সার্থক করেছেন কি না জানি না, কিন্তু আমাকে কৃতার্থ করেছেন।

জীবনের এ সায়াহ্নে অতীতের ছন্দহারা স্মৃতিগুলি কুড়িয়ে এনে একটা নিবন্ধের মধ্যে নিবদ্ধ করলাম। যদি কোনও অবসর ক্ষণে কারো প্রাণে সহানুভূতির একটা পরশ দিয়ে যেতে পারে—এ প্রয়াস সার্থক মনে করবো।

শিশুমাসিক 'মাসপয়লা' সম্পাদক স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও কতিপয় তরুণ ও প্রবীন বন্ধুর বিশেষতঃ সুলেখক শিশুনাট্যকার শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের উৎসাহে ও সহানুভূতিতে আমার এই চেষ্টা সফল হয়েছে। এজন্য আমি তাঁদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু পাঠকগণ যদি গালাগাল দেন—আমি একটুকুও বেজার হবো না।

আমার অনুপস্থিতিতে মুদ্রণকার্য্য শেষ হবার জন্য কতকগুলি মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেছে। আশা করি এ ত্রুটি মার্জ্জনীয় হবে। ইতি—

দীপালি ১৩৩৮
কলিকাতা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ মিত্র

আলাপে

প্রলাপে

আলাপে

ভাগলপুর চিত্র

ভাগলপুরের নাম অনেকদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি। ঘটনাচক্রে একদিন শুনিলাম আমাকে সেখানে যাইতে হইবে! সে আজ এক বৎসরের কথা।

দারুণ গ্রীষ্ম। গিন্নি বলিলেন, "আমি তোমার সঙ্গে যাইব না। তুমি সমস্ত বোচ্‌কা বুচ্‌কি জিনিষপত্র লইয়া আগে রওয়ানা হও। সেখানে পৌছিয়া সব ঠিকঠাক কর, শেষে আমি যাইব।"

"যো হুকুম হুজুর" বলিয়া সেলামপূর্ব্বক বিদায় লইলাম। রাত্রি ৮টার সময় হাবড়া ষ্টেশন হইতে রেলে চড়িয়া তাহার পরদিন সকাল ৭টার সময় ভাগলপুরে উপস্থিত হইলাম।

রেলওয়ে ষ্টেশনটি সনাতন। চেহারা হৃদয় বিদারক। প্লাট্‌ফরম অপরিষ্কার অসমতল। তাড়াতাড়ি চলিতে গেলে পা ভাঙ্গিবার ভয় হয়। ষ্টেশনের বাহিরে হরেক রকমের যান—টমটম, পালকী, ঘোড়া ও গরুর গাড়ী। এখানকার টমটম—পশ্চিমের এক্কা। ঘোড়ার গাড়ীর অবস্থা একটু প্রকাশ করিয়া বলিবার মত। প্রায় সবগুলির রং ও আকৃতি এক।—শাদা থার্ডক্লাস। গাড়ীর দরজা এত ছোট যে আমার মত লোক অতি কষ্টে গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে পারে। ভিতরের গদি যেন রামশিলা। অল্পক্ষণ বসিলেই পশ্চাৎ প্রদেশে ফোস্কা হইয়া উঠে। তারপর, যখন ঘোড়া ছোটে, তখন মনে হয়—এইবার চাকা খুলিয়া পড়িবে। প্রাণ হাতে করিয়া যাইতে হয়; ঘোড়াগুলা যেন কোকেনসেবী সহুরে গাধা।০ একেবারে

ঘিয়ে ভাজা, হাড় কখানি সার। পশুর প্রতি দয়ামায়ার আইন জারি আছে বটে, কিন্তু ঠক্ বাছতে গাঁ উজাড় হবার ভয়ে "কারোয়াই' আপাততঃ স্থগিত আছে।

এক মাইল যাইতে না যাইতে দেখি, সহরে 'মেমোরিয়ালে'র ছড়াছড়ি। এখানে এঁর 'মেমোরিয়াল' ওখানে ওঁর মেমো-রিয়াল'। সর্ব্বসমেত যে কত, তাহার ঠিকানা করিয়া উঠা ভার। আধ ঘণ্টার ভিতর ৫।৭টি 'মেমোরিয়াল' পার হইলাম। এ সব এক উকিল রাজার কাণ্ড। তিনি যদিও পরলোকে গিয়াছেন, তবু 'মেমোরিয়ালের জোরে এখনও ইহলোকে বাঁচিয়া আছেন বলা যায়! পুরাতন মেমোরিয়াল একটির নাম উল্লেখযোগ্য। সেটা ফ্লিডলাণ্ড সাহেবের নামে। তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি, দয়া মায়া, ও ক্ষমার তারিফ আজও শুনা যায়। ইনি সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় সাঁওতাল বিদ্রোহের বিচার সাঁওতাল জুরি দ্বারা করাইতেন ও নিজে তাহার প্রেসিডেণ্ট ছিলেন।

সহরের প্রধান রাস্তাগুলি প্রশস্ত ও উঁচুনীচু—পাহাড়ে দেশে যেমন হয়। সহরে পাহাড় নাই কিন্তু দেহাতে আছে। মন্দারের নাম অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। তাহা এই জেলায়। ষ্টেশন হইতে সহরে যাইবার দুইটি রাস্তা। একটি আদালতের দিকে ও একটি গঙ্গার দিকে গিয়াছে। রাস্তার দুই পাশে ড্রেন ও দুর্গন্ধ। ফ্লাসিং একেবারে হয় না। জলের কল আছে কিন্তু জল সব স্থানে যায় না ও কলে সব সময়ে জল থাকে না। এত গরদা যে চোক, কান, নাক ও মুখ বন্ধ করিয়া না যাইলে বেঘোরে বেহারে অকালে

অক্কা পাইবার আশঙ্কা আছে। যখন কোন জবরদস্ত কমিশনার কিম্বা কলেক্টর আসেন, তখন চেয়ারম্যান সাহেবের ভাইস্ মহাশয় সাহেব বাহাদুরের বাড়ী যাইবার রাস্তা জলে ভাসাইয়া দেন ও দু এক ফোঁটা জল এদিক ওদিক ছড়াইয়া আহ্লাদে আটখানা হন, এবং কৈশর ই-হিন্দ মেডালের স্বপ্ন দেখেন। মিউনিসিপ্যালিটির দৌড় খুব,—লম্বে ৯।১০ মাইল, চওড়ায় ২।৩ মাইল। গরদা কাঁচা পাকা। কতক রাস্তা কাঁচা, কতক রাস্তা পাকা। দুয়ের মিশ্রণে এক অদ্ভুত উপাদেয় কাঁচা পাকা গরদা উঠে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া কর্ত্তাদের খোঁজ লইতে ইচ্ছা হইল। চেয়ারম্যান ও তাঁহার ভাইস দুজনেই বে-সরকারী—পেশা ওকালতী। লোকে বলে—চোক আছে দেখেন না, কান আছে শোনেন না। ঘরে বসিয়া সাধারণের হিত চিন্তা করেন। না হইলে এমন উত্তম ঘোড়ার গাড়ী জারি করিয়া ও এমন গরদা উড়াইয়া মানুষ কমাইবার ফিকির করিবেন কেন? দুজনের মধ্যে বড়ই সদ্ভাব। বেহারী ও বাঙ্গালী বলিয়া একটুও কিন্তু প্রভেদ নাই। যেন রাম লক্ষণ। রাম যাহা করেন, লক্ষণ তাহার অনুমোদন করেন। দুজনের রুচিও এক। রাম বড়, কাজেই সাহেব মহলে প্রতিপত্তি বেশী। লক্ষণের এখনও ততটা হয় নাই।

যে বাসা আমার জন্য ঠিক হইয়াছিল তাহা ষ্টেশন হইতে দেড় মাইল। বাসায় আসিয়াই দেখি, দুইজন ভদ্রলোক আমাকে 'রিসিভ' করিবার জন্য উপস্থিত। একজন সদরালা ও একজন ডেপুটি। সদরালা সাহেবের পায়ে চটি, গায়ে হাতকাটা জামা। আজকাল অনেক সদরালা কাপড় পরেন না। এক লম্বা জামাতেই

লজ্জা নিবারণ করেন। কারণ যুদ্ধের সময় লোকে কাপড় বুনিয়া সময় নষ্ট করিলে 'মিউনিশনের' অভাব হইতে পারে। কিন্তু এ সদরালা তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতাদের মত নন। সুতরাং একখানি ছোট ধুতি পরিয়া আসিয়াছিলেন। ডেপুটি সাহেবকে দেখিয়া মনে হইল, সাহেব সবে মাঠে ঘোড়দৌড় করিয়া ঘোড়া হইতে নামিয়াছেন। এখনও বাসায় গিয়া ড্রেস্ বদলাইবার ফুরসৎ পান নাই। হাতে চাবুক, পায়ে পটি ও বুট, অঙ্গে কোটও রাইডিং ব্রিচেস্ অনুসন্ধানে জানিলাম, ইনি যুবা বয়সে ভারি ঘোড় সওয়ার ছিলেন। এখন ঘোড়া কিম্বা কোন চতুষ্পদ জানোয়ার ইঁহার ঘরে নাই। কিন্তু ঘোড়া চড়ার নেশা ছুটে নাই। দুইজনেই প্রাচীন। আমার আদর সম্ভাষণ ও সাময়িক প্রয়োজনাদির ব্যবস্থা করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ইঁহাদের প্রস্থানের পর আমি স্নান করিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই জঠরাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। বাজারে জলখাবার আনিতে লোক পাঠাইলাম। লোকটা সন্দেশ, খাজা ও টিক্‌রি লইয়া উপস্থিত হইল। সন্দেশ ধোঁয়ার গন্ধ,—উদরস্থ করিতে পারিলাম না। খাজা, বর্দ্ধমানের চেয়ে ভাল। টিক্‌রি খাস্তা ও উপাদেয়।

জলযোগ সারিতে না সারিতেই প্লেগের কথা মনে হইল। শুনিলাম এখনও প্লেগ হইতেছে। সুতরাং এ যাত্রা যে পৈতৃক প্রাণ বাঁচাইয়া দেশে ফিরিব, সে আশা বড় কম। যাহার সঙ্গে দেখা হয়, তিনিই বলেন 'সাবধান'। কিন্তু কোন বিষয়ে সাবধান হইব কেহই বলেন না। প্রাণের ভয়ে দেশী বিদেশী ডাক্তারদের

সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। ডাক্তার সাহেব বলেন, "ইঁদুর হইতে সতত দূরে থাকিবে"—সহরে তিন লক্ষ ইঁদুরের বাস। ইঁদুর বংশ ধ্বংস করিতে না পারিলে প্লেগ সহর ছাড়িবে না। অনেকে জানে না যে এক জোড়া ইঁদুর হইতে বৎসরে ৬৫০ সন্ততি হয়। এমন বংশের ধ্বংস যে কি দুরূহ ব্যাপার তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। সকলের সহায়তা আবশ্যক। অতএব আমাকেও এবিষয়ে অনুরোধ করিলেন। আমিও ভয়ে একটি মস্ত "হুঁ" বলিলাম। ইঁদুর মারিবার বিষ ঘরে আসিল। রোজ কয়েকটি করিয়া ইঁদুর মারি ও ভরসা বাড়াই। বুঝি এ যাত্রা রক্ষা পাইলাম। শুনি, কিছুদিন পূর্ব্বে যে সিভিল সার্জ্জন ছিলেন তাঁর ইঁদুরের ভয় আরও বেশী ছিল। বলিতেন—যদি বাড়ীর একক্রোশের মধ্যে ইঁদুর মরে তবে বাড়ী ছাড়া উচিত। কেহ তাঁহার কথা শুনিত না, বুঝিত না; সুতরাং শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং একদিন বাড়ী ছাড়িয়া অজ্ঞাতবাসে যাইলেন। সেই সময়ে সহরে দু একজন প্লেগে মরে ও ডাক্তার বাহাদুরের হাতার আধক্রোশ দূরে একটা মরা ইঁদুর দেখা যায়। ডাক্তার সাহেবের সৎসাহসের প্রশংসা সহরে রাষ্ট্র হইল। সাহেব মহলে ক্ল্যাপ পড়িল। ডাক্তার সাহেব ঘরে ফিরিলেন। তাঁহার কাণ্ড দেখিয়া সেবার প্লেগও লজ্জায় পলায়ন করিল!

তিন দিন, তিন রাত্রি বাসের পর দুই একটি তথ্য অনুসন্ধানে নির্গত হইলাম। আমার এক বন্ধু বলিয়াছিলেন "ওহে ভাগলপুরে বড় বড় গাই পাওয়া যায়। আমার জন্য একটি ভাল গাই পাঠাইও।" সহর দেহাত সব ঘুরিলাম। যাহাকে আমরা কলিকাতায় ভাগলপুরী

গাই বলি তাহার ঠিকানা কোথাও পাইলাম না। বাঙ্গালায় যেমন ছোট ছোট গাই এখানেও সেইরূপ। বোধহয় 'গাধার' স্থলে ভ্রমে 'গাই' শব্দ আনাড়ি লোক কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানকার গাই বাঙ্গালার চেয়ে আরও জীর্ণ শীর্ণ। দুধও অল্প দেয়। বাঙ্গালার চেয়ে ভাগলপুরের মাটি, জল ও বাতাস ভাল, মাটি ত ভালই। কারণ এখানকার তরিতরকারি, ফল, মূল, ফুল বাঙ্গালার চেয়ে ভাল। জল বাতাস যে ভাল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। দুর্ব্বল বাঙ্গালী এখানে আসিলে শীঘ্র সবল হয়। রুগ্না ও বন্ধ্যা বাঙ্গালিনী অচিরে সুস্থা ও পুত্রবতী হন। বৎসর পার হইতে না হইতেই এক একটি রত্ন প্রসব করেন। আমাদের পাড়ার মিত্র গিন্নির ৯টি সন্তান, ঘোষগিন্নির ১১টি ও ভট্টাচার্য্যগিন্নির ১৩টি। শুনি এই তিন গিন্নিরা যখন বাঙ্গালায় ছিলেন তখন তাঁহাদের পুত্র হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। ভাগলপুরের জল বায়ু সেবন করিয়া ১০।১২ বৎসরের মধ্যে এমন তরক্কি করিয়াছেন।

ভাগ্যবানের দেশ ভাগলপুর। গলিতে গলিতে রাজা, কুমার, জমিদার ও ব্যাঙ্কার। মন্ত্রী পরিষদের ত কথাই নাই। প্রবাদ আছে যে মগধের রাজা জরাসন্ধ এই প্রদেশে সেণ্ট্রাল জেল স্থাপন করিয়া অনেক রাজাকে বন্দী রাখেন। বর্ত্তমান সময়ে মহারাজা, রাজা ও কুমার হইয়া ভাগলপুরের আশেপাশে বিরাজ করিতেছেন।

মান্ধাতার আমলে শ্বশুর এদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বাসা কোথায় ছিল, তাঁহার বন্ধুদের কে কে জীবিত আছেন, তাঁহার

গুরু স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ীর গ্রীষ্মাবাস কোথায় ছিল এই সব গভীর গবেষণার ভার আমার উপর পড়িল। শ্বশুর মহাশয়ের বাসা ও তাঁহার গুরুর গ্রীষ্মাবাস কোথায় ছিল সে সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে নির্ণয় করিয়া ফেলিলাম এবং সে সব স্থানের ফটো লইয়া পরে পাঠাইব মনে মনে এমন সঙ্কল্পও করিলাম।

শ্বশুর বাড়ীর কাজ যখন খতম হইল তখন সাধারণ গবেষণায় হাত দিলাম। তাহার নমুনা দিতেছি। অবধান করিয়া শ্রবণ করিলে বাধিত হইব।

ধর্ম্ম—প্রথমে ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখি পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ধর্ম্মের সমন্বয় এখানে হইয়াছে। হিন্দু, ব্রাহ্ম, থিওসফিষ্ট জৈন, মুসলমান ও খৃষ্টান সকলেই আছেন ও তাঁহাদের আপন আপন মন্দির আছে। কেহ কাহার সহিত লড়াই ঝগড়া করে না।

হিন্দুদের বুঢ়ানাথের মন্দির, যোগশর মহল্লায়। গঙ্গার উপরে প্রতিদিন পূজা পাঠ হয়। এ মন্দিরে আহ্বান নাই, প্রত্যাখ্যানও নাই। সকলেরই অবারিত দ্বার। ধর্ম্মটা স্ত্রীলোকেরা এখনও রাখিয়াছেন। বুঝি আর থাকে না। তবে গোড়াটা শক্ত বলিয়া যা ভরসা। কত কত ঘাত প্রতিঘাত চতুর্দ্দিক হইতে আসিতেছে যাইতেছে, কিন্তু ধর্ম্মটা এখনও খাড়া আছে। পুরুষদের মধ্যে কেহ কেহ পূজা করেন বটে কিন্তু মনটা যেন কোথায় আছে খুঁজিয়া পান না। গঙ্গার উপর পাকা ঘাট। মন্দিরটি ১০০।১৫০ বৎসরের পুরাতন। এ মন্দিরে শিবের একজন Steward আছেন।

তাঁহার নাম মোহন্ত মহারাজ। শিব মহাশয়কে বড় বেশী খাওয়ান না, পাছে অগ্নিমান্দ্য হয়। তবে নিজে বেশ হৃষ্টপুষ্ট। কয়েকজন লোক পাঁটার মুড়ির লোভে তাঁহাকে সরাইবার জন্য মামলা জুড়িয়াছে। মামলাকারীদের ভিতর একজন লোক শিবের 'চড়ুয়া' অর্থাৎ তাঁহার মা বাপ তাঁহাকে শৈশবস্থায় শিবের মস্তকে চড়ান। সেই অবধি তিনি শিবের মন্দিরে শিবস্ব হইয়া আছেন। সুতরাং বলেন তাঁহার দাবী অন্যের অপেক্ষা বেশী। এখন মোকদ্দমা হাইকোর্টে বিচারাধীন। শুনিয়াছি এই মন্দিরে প্রতিদিন গাঁজার ভোগ হয় ও অনেক লোকে প্রসাদ পায়।

বুঢ়ানাথের মন্দিরের সন্নিকটে পুরাকালে হিন্দু বিধবারা 'সতী' হইতেন। সতীদের বংশধরেরা ঐ স্থানে ছোট ছোট স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, এবং মধ্যে মধ্যে আসিয়া পূজা করেন। এ স্থান অতি রমণীয়। অতীতের অনেক কথা মনে আসে। যে প্রেমাগ্নিতে শ্রীরাধিকা একদিন নিজের দেহ মন পবিত্র করিয়া ভগবানের পাদপদ্মে দিয়াছিলেন, সতীরা সেই অগ্নিতেই নিজেদের দেহ ভস্মসাৎ করিয়া সূক্ষ্ম শরীরে পতির পতি জগতের পতির সহিত মিলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই ভাবেই আমি সতীর সহমরণ দেখি অন্যে যে যা বলুক।

শিবের স্ত্রী গঙ্গা। মা এখন সশরীরে ভাগলপুরে আছেন। সহর গঙ্গার ঠিক দক্ষিণপাড়ে। নদী গত বর্ষাকাল হইতে সহরের দিকে আসিতেছে। সে সঙ্গে সঙ্গে প্লেগও কমিয়াছে। এই জন্য সাধারণ লোকের গঙ্গার প্রতি এত ভক্তি। আর বৎসর গ্রীষ্মকালে

ভাগলপুর চিত্র

যখন আমি আসি তখন সহর যমুনিয়ার তীরে। গঙ্গা ও যমুনিয়ার মধ্যে 'দিয়ারা' বস্তি ছিল। বোধ হয় মা গঙ্গা সহরে লোকের সভ্যতার জ্বালায় তাহাদিগকে দূরে রাখিয়া দিয়ারার অসভ্য লোকদিগকে ক্রোড়ে স্থান দিয়াছিলেন। মার মহিমা অনন্ত। সকলে বুঝিতে পারে না। অনেক বৎসর পরে এবার মা একেবারে সহরে আসিয়াছেন। ভক্তেরা বলিতেছে আর ভয় নাই। কারণ শিব মহাশয় এখন আর শীঘ্র মাকে যাইতে দিবেন না। এই মিলনের ফল যে কি হইবে তাহা জ্যোতিষীরা বলিতে পারেন। তবে নদীর দক্ষিণপাড় যে রকম ভাঙ্গিতেছে তাহাতে বোধহয় মা ২।৪ খানি ঘর বাড়ী শীঘ্রই উদরস্থ করিবেন। এবার এত খরস্রোত যে হাতি ভাসিয়া যাইতেছে। এত বেগ বুঢ়নাথ বেচারী আর কতদিন নিজের মস্তকে ধারণ করিয়া সহরকে বাঁচাইবেন? দেবতার সঙ্গে বিজ্ঞানের কথা চলে না। তবে লাগাইতে ক্ষতি কি? আমার বোধ হয় যেবার নদীতে বেশী বাণ হয় সেবার সহরের সব ময়লা ধুইয়া যায় ও গর্ত্তে জল ঢুকিয়া ইঁদুর বংশের নাশ করে। তাই প্লেগ কমিয়া যায়।

সহরের বাহিরে দুইটি তীর্থস্থান আছে। সুলতান গঞ্জের গৈবীনাথ ও মন্দারের মধুসূদন। পুণ্যের জোরে এদুটিরই দর্শনলাভ করিয়াছি। সুলতানগঞ্জে গঙ্গার মধ্যস্থলে পাহাড়। তাহার উপর গৈবীনাথের মন্দির। প্রবাদ আছে যে এক সাধু প্রত্যহ ত্রিশক্রোশ ভাঙ্গিয়া এই পাহাড়ের তলদেশ হইতে গঙ্গাজল লইয়া গিয়া বৈদ্যনাথের শিবের মস্তকে ঢালিতেন। ভোলানাথ সাধুর এ ভীষণ

ভক্তিময় কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া বলেন, "তোমার এত কষ্ট করিয়া জল আনিতে হইবে না। তুমি যেখান হইতে জল আন আমি সেইখানেই আবির্ভূত হইব।" সুলতানগঞ্জে গঙ্গা উত্তর বাহিনী শিলা সঙ্গমে আরও মাহাত্ম্য বাড়িয়াছে।

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে! ভাগলপুরে আসিয়া তোমার তীরে অনেক সময় কাটাইয়াছি। সূর্য্যোদয়ে, সূর্য্যাস্তে ও চন্দ্রালোকে তোমার রূপের ছটা দেখিয়াছি। বাতাসে রৌদ্রে ও মেঘজালে তোমার রুদ্র সৌম্য ও যুগলমূর্ত্তি দেখিয়া নয়ন সার্থক করিয়াছি। গ্রীষ্মে, বর্ষায়, শীতে তোমার পূত সলিলাক্ত চরণ স্পর্শ করিয়া কতই আনন্দ অনুভব করিয়াছি। প্রকৃতি ও মানুষের মনের সহিত যে তোমার এত ভালবাসা তাহা অগ্রে বুঝি নাই। এই জন্য তোমার নামের এত মহিমা। তোমার ইতিহাসে কত সত্য কত রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহা নির্ণয় করা আমার মত অকৃতীর সাধ্য নহে।

মন্দার পর্ব্বত ৭০০।৮০০ ফুট উচ্চ। ইহা বাঁউসির নিকট। বাঁউসি এখন একটি ছোট 'হিল ষ্টেশন'। সেখানে কয়েকজন লোক বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মধুসূদনের অনুগ্রহে বাঁউসিতে এ পর্য্যন্ত প্লেগ হয় নাই। কথিত আছে এক রাজা এই পাহাড়ের নিম্নস্থ তড়াগের জল ব্যবহার করিয়া কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হন ও কৃতজ্ঞতাসূত্রে পাহাড়ের উপর সিঁড়ি নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু মন্দার পাহাড়ের উপর মধুসূদন এখন থাকেন না। জৈনেরা পার্ব্বতীয় মন্দিরটি দখল করিয়াছেন। মন্দিরে বিষ্ণুর পাদপদ্ম আছে।

পরেশনাথের পরেই জৈনদের এটি একটি প্রাচীন তীর্থস্থান। এই পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড করিয়া পুরাকালে দেবাসুরেরা সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন। সেই জন্য মনে হয় এক সময় মন্দার সমুদ্রগর্ভে ছিল। এখন অন্যরূপ হইয়াছে। ভূতত্ত্বের ইতিহাস পড়িলে কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায়।

ভাগলপুরে হিন্দুর সংখ্যাই বেশী। দেবদেবীর মূর্ত্তিও অনেক। হিন্দুরা পুতুল পূজা করে বলিয়া অনেকে অনেক অযথা কথা বলেন। যাঁহাকে আমরা ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি, তাঁহাকেই আমরা পূজা করি। তাঁহার মায়াময় পুতুল ও পট সেইজন্যই প্রস্তুত করি। আমরা ভগবানেব মহিমা ও শক্তির ইয়ত্তা করিতে পারি না; কল্পনার সাহায্যে ভগবানের অনন্তরূপ ও শক্তি অনুভব করি ও তাহারই প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করি। হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতাও সেই অনন্তরূপ ও শক্তির মহিমা সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতে অক্ষম। আরও কয়েক কোটি হইলে ভাল হয়।

ভাগলপুরের ব্রাহ্ম সমাজের কথাটা এখন বলি। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাহার ঢেউ ভাগলপুরে অনুমান ১৮৭৫ খৃঃ অঃ আসে। সুতরাং ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজের বয়স এখন প্রায় ৪০ বৎসর। অথচ ব্রাহ্ম সংখ্যা এখানে ২০।২৫ জন লোকের অধিক নহে। এই ২০।২৫ জনের ভিতর ২।৩টি বেহারী আর বাকী সব বাঙ্গালী।

ব্রাহ্মদের প্রথমে সমাজগৃহ ছিল না। ঘরে ঘরে উপাসনা হইত। এখন প্রতি রবিবারে সন্ধ্যার সময় স্ত্রী পুরুষে মিলিয়া

ব্রাহ্মগণ সমাজে আসেন। অনুমান ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে একজন হিন্দু-রাজা সমাজ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। রাজার বেশ দূরদৃষ্টি ছিল। যে গৃহ তিনি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে ৪০।৫০ জনের উপর দীক্ষিত হইলে আর বসিবার স্থান হইত না। আমি ব্রাহ্মগণের যে বর্ত্তমান সংখ্যা নিরূপণ করিয়াছি তাহার বিশেষ প্রমাণ আছে। এক সাম্বৎসরিক অধিবেশনে গিয়াছিলাম। বসিয়া বসিয়া উপাসনা হইতেছিল। ইতিমধ্যে আচার্য্য মহাশয় বেদী হইতে বলিয়া উঠিলেন "এস ভাই দণ্ডায়মান হইয়া প্রার্থনা করি।" তখন দেখি, বাজে লোকেরা আস্তে আস্তে চোরের মত সরিয়া পড়িল। শেষ পর্য্যন্ত ২০।২৫ জন রহিল। ঠিক করিলাম ইঁহারা নিশ্চয়ই খাঁটি ব্রাহ্ম। সব ধর্ম্মে আমার সমান আস্থা। তবে ঠিক কথা বলিতে গেলে, যে ধর্ম্মে যত লোক তার গায়ে তত জোর। ইহাকেই বলে "যতোধর্ম্ম স্ততো জয়।"

"সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মের" এখানে এক শাখা আছে। তাহার মন্দির বিক্রমপুরে। মন্দিরের প্রধান পাণ্ডা কোন গূঢ় কারণে দুই বৎসরের ফারলো লইয়াছেন। সেই সঙ্গে চেলারাও গা ঢাকা দিয়াছেন। এক বৎসরের ভিতর একদিনও পূজা পাঠ দেখি নাই। শুনি, মন্দির এখন ভাড়া খাটিতেছে। মন্দিরের পয়সা হইলে গরীবের দুঃখ মোচন হইবে এই আশায় অনেকে বসিয়া আছে।

জৈনদের দুই দল। দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর। এক বলেন, দশদিকই ভগবানের আবরণ সুতরাং তাঁহার অন্য আবরণ হইতে পারে না। অন্যদল ভগবানকে শ্বেতবস্ত্রে আবৃত করেন। চম্পা-

নগরে ইঁহাদের যে মন্দির আছে তাহার পৃথক পৃথক প্রকোষ্ঠে ভগবান বুদ্ধদেবের দ্বিগম্বর ও শ্বেতাম্বর মূর্ত্তি আছে ও প্রত্যহ পূজা হইয়া থাকে। মন্দিরে প্রাতঃকালে গিয়াছিলাম। কুঙ্কুম, চন্দন ও পুষ্পের গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত। মন মোহিত হইয়া গেল। সেখানে হিংসা প্রবৃত্তি নাই সুতরাং মাছি ও পিপীলিকার সমস্যা গুরুতর।

মুসলমানদের এখানে এক প্রাচীন মস্‌জিদ আছে। তাহা মওলানা সাহেবাজ সা ফকিরের নামে। ইহা রেলওয়ে ষ্টেশনের দক্ষিণে। ইহাতে হাজার হাজার মুসলমান প্রত্যহ নেমাজ করেন। পরলোকগত বাবু সূর্য্যনারায়ণ সিংহের খঞ্জরপুর প্রাসাদের সন্নিকটে, গঙ্গাতীরে এক মস্‌জিদ ও কবরস্থান আছে। তাহা অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। ইহার ইতিহাস এখনও পাই নাই।

খৃষ্টানদের সহরে ও দেহাতে গির্জ্জা আছে। প্রতি রবিবারে উপাসনা হয়। ইহাদের কোন কথা আমি জানিতে চেষ্টা করি নাই।

সাহিত্য

ধর্ম্মরাজ্য হইতে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ করিয়া দেখি যে, ক্ষেত চাষ অভাবে শুষ্ক প্রায়। মধ্যে মধ্যে দু একজন সখের চাষ দিতে আসেন আর বেগতিক দেখিয়া পশ্চাৎপদ হন। বাজার খারাপ দেখিয়া বড় বড় চাষীরা হাল ছাড়িয়া বসিয়া আছেন!

দেশের লোকের খাওয়া পরা শোয়া বসার সঙ্গে সাহিত্যের কিছু সম্বন্ধ আছে। সুতরাং এখানকার সাহিত্যে ডাল ভাত ধুতি চাদরের সাতু লিটি মৃজাই মুরেঠার রুটি কাবাব পাজামা আচ্‌কানের ছায়া পাওয়া যায়।

আলাপে

ভাগলপুরবাসী বাঙ্গালী সভ্যেরা বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের শাখায় বসিয়া সারাদিন গান করিতেন। বাসা বাঁধিবার সময় পাইতেন না। লোকে মনে করিয়াছিল গান কমিলে, বাসা হইবে। গান ত কমিয়াছে কিন্তু বাসা বাঁধা হয় নাই। অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। ইনি বলেন আমি বড়, উনি বলেন আমিও বড় কেও কেটা নই। দুইটি দল। একদল বলেন যে—গণ্যমান্য ব্যক্তির সভাপতি হওয়া উচিত। আর একদল বলেন প্রকৃত সাহিত্য-সেবীরই সভাপতি হওয়া উচিত। লক্ষ্মী স্বরস্বতীর দ্বন্দ্বে সরস্বতীর হার হইয়াছে। এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে কেহ কেহ আশঙ্কা করিতেছেন এইবার শাখাও ভাঙ্গিতে পারে। পরিষদের শাখার এক অধিবেশনে গিয়া দেখি, এক গণ্যমান্য সভাপতি মহাশয় বলিতেছেন, "আমি এতদিন মাতৃভাষার কোন সেবা করি নাই। সে জন্য বিশেষ লজ্জিত আছি। কিন্তু এখন হইতে সুদে আসলে শোধ দিতে চেষ্টা করিব।" ইহাতেই শ্রোতাদের করতালি পড়িল, আর এত ঘন ঘন ভাবে যে—সভাপতি মহাশয়কে শেষে তাহা বন্ধ করিতে হইল। ভাগলপুরের আশে পাশে অনেক বিষয় দেখিবার ও লিখিবার আছে। অধিকাংশ সভ্যেরা এ সমস্ত ক্ষুদ্র বিষয়ে মন দেন না। বঙ্কিম, রবীন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রের বঙ্গ সাহিত্যে কি স্থান ও কেন তাহার সুদীর্ঘ মন্তব্য মধ্যে মধ্যে প্রকাশ করেন। কি করিলে তাঁহাদের মত লিখিতে পারা যায় তাহার চেষ্টা নাই বলিলেই হয়। অনেক গর্জ্জনের পর মধ্যে মধ্যে এক এক ফোঁটা বৃষ্টি হয় আর গরমে মানুষ মারা যায়। ক্ষেতের কোনই উপকার

হয় না। প্রাকৃতিক জগতে দেখি পক্ষীরা আগে বাসা বাঁধে, তবে ডিম পাড়ে। ভাগলপুর সাহিত্য জগতের পক্ষীরা আগে ডিম পাড়ে কিন্তু বাসা বাঁধে না। সেইজন্য বোধ হয় ডিম ফোটে না। তাই বলি এখন হইতে খড় কুটা যোগাড় করা নিতান্ত আবশ্যক। অট্টালিকা নাই বা হইল পর্ণকুটীর অনায়াসে হইতে পারে। তাহাতেই ডিম ফুটিবে।

হিন্দি সাহিত্যে একজন লোকের যে প্রকার উদ্যম দেখিয়াছি। তাহা সাহিত্য পরিষদের ভাগলপুর শাখার সমগ্র সভ্যদের নাই। ইনি "শ্রীকমলা" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ভাগলপুর হইতে প্রকাশ করিতেছেন। "শ্রীকমলাতে" সাতু-লিটি চুড়া দহির অধিকন্তু ডালপুরি পাঁপরের সুগন্ধ আছে। একজন চৌবে জমিদার হিন্দি সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য একটি সুন্দর ও স্থায়ী পুস্তকাগার করিয়া দিয়াছেন।

এখানে একটি পাবলিক লাইব্রেরী আছে। বাঙ্গালীরাই তত্ত্বাবধান করেন। লাইব্রেরীর ঘর নাই, কিন্তু দুয়ার একটি আছে। দুই চারিটি আলমারিতে বই আছে। অধিকাংশ পুস্তক কীট এবং চোরে দখল করিয়াছে। এত কষ্টের এতদিনের ধন নষ্ট হইতেছে দেখিলে মনে বড় আঘাত লাগে।

শিক্ষা

শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। স্কুল, পাঠশালা কলেজ মাকতাব অনেক হইয়াছে। কিন্তু ছেলে মেয়েদের বিশেষ কিছু হইতেছে না। মাষ্টার, প্রফেসার, মৌলভী, গুরুজী সব যেন এক

ছাঁচে ঢালা ; কাহারও দাড়ি গোঁফ নাই। অধিকাংশ শিক্ষক ছেলেদের খোঁজ রাখেন না। ছেলেরা কি করে, কি পড়ে, কাহার সঙ্গে মিশে কোথায় বেড়ায়, কি কি খেলা করে তাহার খবরই লন না। অনেক ছেলেদের নাম ধাম পর্য্যন্ত জানেন না। শিক্ষক ছাত্রের সম্বন্ধ যেন উঠিয়া যাইতেছে। শিক্ষকের ভালবাসা নাই, ছাত্রেরও ভক্তি নাই। কলেজের প্রফেসার মহাশয় গড় গড় করিয়া ছাই ভস্ম কত কি উগ্দার করিয়া যান ; যদি কোন ছাত্র দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, তবে প্রফেসার মহাশয়ের গম্ভীর মুখমণ্ডলে ক্রোধের রেখা দেখা যায়। মাষ্টার মহাশয়ের মেজাজ্ অতটা কড়া নয়। তিনি ছেলেদের আবদার মাঝে মাঝে শোনেন। তবে রৌদ্রে-জলে ড্রিল করাইয়া তাহাদের দফা রফা করেন। ড্রিল দেখিয়া মনে হয় যে ইহারা পূর্ব্বজন্মে কোন কনেষ্টবলের কি হাবিলদারের প্র-পৌত্র ছিল। এমন ভঙ্গি করিয়া সেলাম করে ও পা ফেলে, দেখিলে মনে হয় যেন শীঘ্রই লড়াই করিতে যাইবে কিম্বা ভব নাট্যশালায় রাবণ বধের রিহার্সাল দিবে। ‘কাওয়াইৎ’ শিখাইবার জন্য সব স্কুল পাঠশালায় যেমন সুবন্দোবস্ত আছে পড়াটার বিষয়ে কিন্তু সেরূপ নাই। ড্রিল, ফুটবল লইয়া প্রায় সমস্ত দিনটা কাটে। পড়া শুনা নাম মাত্র। কোন বিষয়েই কাহারও ব্যুৎপত্তি নাই। বাপ মা যদি জিজ্ঞাসা করেন ছেলের এমন দশা কেন হইতেছে, শিক্ষক অমনি বলিয়া উঠেন, হইবারই ত কথা। ঘরে মাষ্টার না রাখিলে লেখাপড়া হইতেই পারে না। স্কুলে ত কেবল পিতৃশ্রাদ্ধের নূতন আদব কায়দা শেখান হয়।

ছেলেদের ত এই হাল। মেয়েদের কথা এখন কিছু বলি। বেহারী ও বাঙ্গালী মেয়েদের পৃথক পৃথক স্কুল। বেহারী বালিকা বিদ্যালয়ের কথা বিশেষ অবগত নহি। বাঙ্গালী বালিকারা মোক্ষদা স্কুলে ও মিশ্‌নরী স্কুলে পড়ে। শিক্ষার রীতি-নীতি ইংরাজী ছাঁচের। আমাদের বাঙ্গালী মেয়েদের যেন পৃথক অস্তিত্ব নাই। মেয়েরা অযোধ্যার রাম, লঙ্কার রাবণ, অশোক-বনের সীতা এমন কি নিকটস্থ চম্পানগরের বেহুলার কথা ভাল করিয়া জানেও না শেখেও না। কিন্তু অনেক বাজে লোকের কথা শিখিয়াছে—যাহা তাহাদের কখনও কোন উপকারে আসিবে না। ঘরকন্নার হিসাব রাখিতে পারে না কিন্তু লম্বা গুণ ভাগ কষিতে পারে। পূজা পাঠ ও রন্ধনের দিকেই যায় না। ভাল জামা পরিতে পারে, কিন্তু তাহার সেলাই জানে না। গান শুনিতে চায় কিন্তু গাহিতে পারে না। এই সব কাণ্ড দেখিয়া মনে হয় যে প্রকার শিক্ষাতে সাধারণ বালিকার উপকার হইবে তাহার সম্যক উপলব্ধি এখনও আমাদের হয় নাই। আমাদের দেশের সাধারণ বালিকারা ১২।১৩ না হয় ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে পড়ে। তাহার পরে তাহাদের বিবাহ হয়। ইহাদের সময় অল্প। অসাধারণ বালিকারা বি, এ, এম, এ পাশ করেন। অনেকেই বিবাহ করেন না। পুরুষদের মত স্বাধীন ভাবে জীবন নির্ব্বাহ করেন। ইঁহাদের সময় বেশী। কথাটা হচ্ছে যে, এই দুই শ্রেণীর বালিকার শিক্ষা একই প্রণালীতে দিলে কি করিয়া চলিবে? কেহ যেন মনে করিবেন না আমি স্ত্রী শিক্ষার বিদ্বেষী। বলা বাহুল্য, আমি ইহার

গোঁড়া পক্ষপাতী। সেই জন্যএই ক’ ছত্র লিখিলাম। যেদিন মেয়ে মহাভারত রামায়ণ গীতা সুন্দরভাবে পড়িয়া শুনাইবে, যেদিন ব্যবহারযোগ্য পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিবে, যেদিন রুচিকর খাদ্য প্রস্তুত করিয়া দিবে, সেদিন এই জীবনের Red letter day মনে করিব ও স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা বুঝিব।

এছাড়া আরও দুটি নূতন রকমের বিদ্যালয় আছে। তাহার কথাটাও একটু বলা উচিত। একটি নাথনগরের পুলিশ ট্রেনিং স্কুল, অন্যটি সাবরের কৃষি কলেজ।

নাথনগরে ট্রেনিং স্কুলে কনেষ্টবল ও হেডকনেষ্টবল প্রস্তুত হয়। যে উপাদান হইতে এই চিজ গঠিত হয় তাহা সচরাচর ভোজপুর ছাপরা ও বালিয়াতে পাওয়া যায়। ছয়মাস শিক্ষার পর যখন রেক্রুটরা ট্রেনিং হইতে অব্যাহতি পায় ও কাযে যায় তখন ইহাদের বিদ্যা বুদ্ধি ও বিক্রম দেখিয়া অনেকেই অস্থির হন ও বলেন “ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।”

চাষবাস শিখাইবার জন্য সাবরে কৃষি কলেজ হইয়াছে। ভদ্রলোকের ছেলেরা পাখার নীচে, বেঞ্চির উপর বসিয়া, টেবিলের উপর হাত রাখিয়া প্রফেসারের লেকচার শোনে ও কৃষিকার্য্য শেখে। পাঠ শেষ করিয়া মনের কৃষিকার্য্য আরম্ভ করে ও চাকুরির চেষ্টায় এদোর ওদোর ঘুরে ফিরে বেড়ায়। প্রতি বৎসর ১০।১৫ জন ভর্ত্তি হয়। দুই তিন মাস শিক্ষার পর কেহ কেহ বিদায় লয়। সুতরাং কখন কখন শিক্ষকের সংখ্যা ছাত্রের অপেক্ষা অধিক হইয়া পড়ে। তখন শিক্ষকেরা দুই হাত তুলিয়া সরকারকে আশীর্ব্বাদ

ও গোজাতির গবেষণা করিতে থাকেন। সেই গবেষণার ফলে ভাল দুধ, ঘি ও মাখন প্রস্তুত হইয়া তাঁহাদের পরমায়ু বৃদ্ধি করে।

স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে ভাগলপুর স্বর্গ নহে। মর্ত্ত্য-লোকে যে যে ব্যাধি আছে তাহার সবগুলি এখানে দেখা যায়। এসব দেশে প্লেগ ওলাওঠা ও বসন্তরোগের খুব জোর। যখন রোগ চাগে, তখন এক একটি গাঁ উজাড় হইয়া যায়। জ্বরটা যা একটু কম হয় তাই রক্ষা। বাঙ্গালার মত অধিক কোঁ কোঁ করিতে হয় না। ডাক্তার, কবিরাজ, হাকিম অনেক আছেন। দর্শনীর হার বেশ নয়। ২৲ দিলেই বড় ডাক্তার আসেন, বসেন ও গায়ে হাত বুলান। এমন সুবিধার স্থান নাই বলিলেই হয়। ডাক্তার দেখিলে ত মৃত্যুর হাত হইতে নিস্তার নাই। কিছু আগে না হয় পরে। অতএব যেখানে ধনেপ্রাণে মারা যাইবার সম্ভাবনা কম সেই স্থানটাই ভাল।

বিচার আচার

বিচার আচার উকিল হাকিমের কথা বলিতে ভয় হয়। মোকদ্দমা মামলা ঢের কমিয়াছে। লম্বা চওড়া ও বড় বড় উকিলেরা গঙ্গাস্নান ও হরিনামে মত্ত। ইঁহাদের সর্ব্বনাশ, হাকিমদের এখন পৌষমাস। দুগণ্ডা ডেপুটি সব ডেপুটির ভিতর ২৷৷টা ও ১গণ্ডা সদরালা, মুন্সেফের ভিতর ১৷৷টাই সব কাজ সাফ করে। বুড়োরা আপীল শোনে আর জাবর কাটে। ধুঁবাগণ ইয়ারকি দেয় ও ক্ষুধা বাড়ায়।

মামলা কমিয়াছে বলিয়া উকিল বাবুদের দল কমে নাই। বংশ বাড়িয়াই যাইতেছে। 'বহুশের' কোন কমি নাই। সাবেক দস্তুর পুরোপুরি চলিতেছে। গলা খারাপ হইলেও উকিলেরা 'বহুশ' ও চীৎকার ছাড়েন না। উপরন্তু যখন নূতন পেথম ধরিয়া 'বহুশের' সঙ্গে নৃত্য করেন, তখন হাকিমের অন্তরাত্মা শুষ্ক হয়। বেকুব হাকিমেরা এই ভয়ে 'বহুশ' ও নাচের আগেই মনের কথা আতঙ্কে বলিয়া ফেলেন। বুদ্ধিমানেরা 'বহুশ' শুনিবার ভান করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করেন ও সেই সুযোগে নিদ্রাদেবী আসিয়া তাঁহাদের স্কন্ধে চাপে। পরে যখন সব কথা ভুলিয়া যান, তখন রায় প্রকাশ করেন আর উকিল মহলে বাহবা পড়িয়া যায়।

মুখের জোরের কথাটাই বলি। এক ডেপুটি ম্যালেরিয়া প্রপ্রীড়িত মহকুমার ভার প্রাপ্ত হইয়া সপরিবারে তথায় উপস্থিত। কিছুদিন বাসের পর তথাকার মুন্সেফের কুটীরে পদার্পণ করিলেন। মুন্সেফ বাবু ডেপুটী বাবুর এই ভীষণ অনুকম্পায় বড়ই আপ্যায়িত হইয়া বলিলেন "আমার সৌভাগ্য যে আপনার মত মহাশয়ের পদধূলি আমার গৃহে পড়িল।" তুজনে বেশ কথাবার্ত্তা চলিল। কিছুক্ষণ পরে মুন্সেফ বাবু বলিলেন, "এ দেশে ম্যালেরিয়ার বড়ই প্রকোপ। আপনি মধ্যে মধ্যে তুই এক গ্রেণ কুইনাইন খাইবেন।" ডেপুটি সাহেব বলিলেন, "আমাকে কুইনাইন খাইতে হইবে না, আমি ইউরোপীয়ান ষ্টাইলে থাকি। আমার কাছে ম্যালেরিয়া আসিতে পারে না" তুই তিন মাস বাসের পর একদিন সভ্য সত্যই ডেপুটি সাহেবের ঘরে ম্যালেরিয়া প্রবেশ করিল। মুন্সেফ বাবু খবর পাইয়া

ডেপুটি সাহেবের বাংলায় উপস্থিত। দেখেন, সাহেব, মেম, বাবা-লোক সকলেই শয্যায় জ্বরে ছট্ ফট্ করিতেছেন। কিন্তু মুখের জোর কাহারও কমে নাই। ডেপুটি সাহেব বলিলেন, "এইবার সারিয়া উঠিলে দেখিব ম্যালেরিয়া কেমন করিয়া এ মহকুমায় আসিতে পারে।" বেকুব মুন্সেফ বাবু মনে করিলেন সাহেব জ্বরের ধমকে প্রলাপ বকিতেছেন। মস্তকে বরফ দিবার ব্যবস্থা করিয়া প্রস্থান করিলেন।

হকিয়তের হাকিমেরা পূর্ব্বে বড় বেশী কথা কহিতেন না। বোধ হইত যেন নির্জ্জীব ও নিশ্চল। জোরে পা ফেলিতেন না, পাছে জুতা ছেঁড়ে। জোরে কথা কহিতেন না পাছে ক্ষুধা বাড়ে। বসিয়া বসিয়া নজির ঘাঁটিয়া রায় কিন্তু অকাট্য লিখিতেন। প্রিভি কাউন্সিলিরাও দন্তস্ফুট করিতে পারিতেন না। এখন ইহাঁদের কেহ কেহ ঘটিরামের উপর যাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আমি একজন সদরালাকে জানিতাম। তিনি তখন কোন রকম ব্যায়াম করিতেন না। তিনি বলিতেন রায় লেখা ও নজির ঘাঁটার মত 'হোলসম একসারসাইজ' আর দ্বিতীয় নাই ইহাতেই যা খিদে হয় তাহার অন্ন মেলা ভার। Economics ও Hygiens এ হকিয়তী হাকিম-এককালে একচেটে দখল ছিল।

ব্যবসা বাণিজ্য

এক সময়ে এই জেলায় নীলের চাষ হইত। এখন সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই। ভূমিজ নীলের দর্প বিজ্ঞানের হস্তে

চূর্ণ হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক নীলে বাজার পূর্ণ। নীলকরের বংশধরেরা এখন জমিদারী ও মহাজনী করিতেছেন।

নীলকরের প্রতিপত্তি বুঝিতে হইলে এখানকার ঘোড়দৌড়ের মাঠ দেখা আবশ্যক। মাঠটি যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। ঠিক যেন গড়ের মাঠ। শুনিয়াছি নীলকরের টাকাকড়ির দৌড় এই মাঠের মত ছিল। কালের কি কুটিল গতি! যেখানে একদিন শত শত শ্বেতাঙ্গ নীলকর হস্তী ও অশ্বপৃষ্ঠে বিহার করিতেন এখন সেখানে সহস্র সহস্র গো মহিষ বিচরণ করিতেছে আর তাহাদের পার্শ্বে কৃষ্ণকায় বাবুরা পদব্রজে ভ্রমণ করিতে করিতে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও ভক্ষণ করিতেছেন। বায়ু সেবনের স্থান এ সহরে কম। ঘোড়দৌড়ের মাঠ ছাড়া আর দুইটি মাঠ আছে। স্যাণ্ডিস কম্পাউণ্ড ও করণগড়। স্যাণ্ডিস কম্পাউণ্ডে প্রবেশ নিষেধ ও গড় কনেষ্টবলদের হাতে। এত বড় সহরে পার্ক না থাকায় আমাকে রাস্তায় রাস্তায় টো টো করিয়া ফিরিতে ও ধূলা খাইতে হয়। মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স মাসে মাসে ৩৷৹ টাকা করিয়া দিয়া থাকি কিন্তু তাহার বদলে কিছুই পাই না। একজন বিজ্ঞ উকীল ভরসা দিয়াছেন যে খেসারতের নালিশ চলিবে। নীলকরের অবনতির পর ব্যবসা বাণিজ্যে মারওয়ারীরা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। বেহারী ও বাঙ্গালী পশ্চাতে পড়িয়া আছেন। যথা অন্যত্র, তথা অত্র।

লোক

এ দেশের লোকের বিশেষতঃ লালা বাবুদের কথা বলা বড় শক্ত। এঁরা না রাম না রহিম। কি যে—বোঝা ভার। কালাপেড়ে ধুতিও

পরেন টিকিও রাখেন। গঙ্গাস্নানও করেন ও এক বিছানায় বসিয়া বাইজির সহিত পান ও তামাক খান। খড়ম পায়ে সন্তর্পণে 'চৌকার' ভিতর ব্রাহ্মণ প্রস্তুত ডাল ভাত উদরস্থ করেন কিন্তু 'কাহার' প্রস্তুত পুরি মাংসের যেথায় সেথায় বসিয়া শ্রাদ্ধ করেন। অধিকাংশ লোক এক বেলা ছাতু এক বেলা ভাত খান আর না হিন্দি না বাঙ্গালা বুলি বলেন। জল হাওয়ার গুণেই হোক কিম্বা অন্য কোন কারণে এখানে অধিকদিন থাকিলে বেহারী বাঙ্গালী হন, বাঙ্গালী বেহারী হন। উন্নত বেহারীরা বাঙ্গালীর মত খাওয়া, পরা, শোয়া, বসা ও কুস্তি করেন। অনেক বাঙ্গালী বিশেষতঃ উত্তররাঢ়ী কায়স্থ বেহারীর চালে চলেন। তাঁহাদের অশন, বসন, রীতি নীতি আচার ব্যবহার সমস্ত এদেশের মত। পায়ে নাগরা জুতা, গায়ে মিরজাই, কোমরে মালকোচা বিশিষ্ট ধুতি ও মাথায় পাগ্ড়ী। ভক্ষণ ছাতু, বচন ভাঙ্গা হিন্দি, শয়ন খাটিয়ায়। একেবারে হুবহু খোট্টা। বাঙ্গালী যেমন উন্নত হইলে সাহেবের অনুকরণ করেন, বেহারীও তদ্রূপ বাঙ্গালীর অনুকরণ করেন। কেহ কেহ সেইজন্য বলেন বাঙ্গালী বড় বুদ্ধিমান। স্বদেশে ছিলেন বটে, কিন্তু বেহারে থাকিয়া বাঙ্গালীর বুদ্ধি হ্রাস হইয়াছে। কারণ রাহু তাহার অর্দ্ধেক গ্রাস করিয়াছে।

বড় দুঃখের বিষয় যে বেহারী বাঙ্গালী এ দুই জনের ভিতর এখন বিশেষ সদ্ভাব নাই। পূর্ব্বে বিবাহে ও আমোদ প্রমোদে ইঁহাদের প্রীতিভোজন ও মিলন হইত। এখন তাহা উঠিয়া যাইতেছে। বাঙ্গালী মনে করেন তিনি বড়। বেহারী বলেন "কিসে বড়! আমার দেশ, আমার কড়ি, বাঙ্গালী কেন বড় হইবে?" বাঙ্গালী মুখে

দড়, তাই উত্তর করেন "তোমার গ্রহ ও বুদ্ধির দোষে।" এ হীনতা বেকুবের কথা।

বেহারী বাঙ্গালীকে যেমন বুঝিয়াছেন, বাঙ্গালী বেহারীকে তেমন বুঝেন নাই। কারণ এখন শতকরা নিরান্নব্বই জন বেহারী মৎস্য ভক্ষণ করিতেছেন। আর শতকরা নিরনব্বই জন বাঙ্গালী মাছ ছাড়িয়াছেন। মাছেই ত বুদ্ধি! এত আদর যে দুই আনা হইতে এক টাকা মাছের সের হইয়াছে। ফলে বেহারীর বুদ্ধি বাড়িতেছে ও বাঙ্গালীর বুদ্ধি কমিতেছে। আত্মসন্মান বেহারী যেমন রাখিতে জানেন, বাঙ্গালী তেমন জানেন না। বেহারী রাজপুত নাম সই করেন "বাবু মেদিনীপ্রসাদ সিংহ।" বাঙ্গালী ক্ষত্রিয় নাম সই করেন "ভবনাথ রায়।" পরের কাছে ভিক্ষা করিবার পক্ষে নিজের উপর নির্ভর করা ভাল। বাহুবলে, বুদ্ধিবলে ও আত্মসম্মানে বেহারী এখন বাঙ্গালী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তবে আর কেন আশঙ্কা?

বাঙ্গালীর মধ্যে কেহ কেহ এখনও বলেন, "মাছ খাওয়া যেমন সোজা, ধরা তেমন সোজা নয়। তাই যা ভরসা।" ইলিশ মাছে 'ফস্‌ফরস্‌' বেশী। ফস্‌ফরস্‌ মস্তিস্কের খাদ্য। এই মাছ ধরিবার জন্য বেহারীকে বাঙ্গালীর দ্বারস্থ হইতে হয়। রাজমহল ও ধূলিয়ানের বাঙ্গালী জেলেরা আসিয়া এদেশে গঙ্গায় ইলিশ মাছ ধরে তবে বেহারীরা খাইতে পান। এই সামান্য মাছ ধরার দোহাই দিয়া কোন কোন অদূরদর্শী ব্যক্তি সন্দেহ করেন যে আরও কিছুদিন বেহারীকে বাঙ্গালীর উপর নির্ভর করিতে হইবে। আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না। মাছ ধরিবার জন্য বেহারীকে এত চেষ্টা করিতে

দেখিয়াছি যে তাহার ফল শীঘ্রই ফলিবে। একজন বাঙ্গালী ও এক-জন বেহারী এক পুষ্করিণীতে মৎস্য শিকারে যান। বাঙ্গালী বাবু অল্পক্ষণের মধ্যে অনেক মৎস্য ধরেন। বেহারী বাবু ছিপ্ লইয়া অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া একটিও মাছ ধরিতে পারেন না। অবশেষে পুষ্করিণীতে ২০।২৫ টা মহিষ নাবাইয়া দেন। মহিষের পৃষ্ঠে লোক চড়িল ও বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। মার খাইয়া মহিষেরা জল তলাতল করিল, আর ভয়ে মাছ ঊর্দ্ধে লাফাইতে লাগিল। তখন বন্দুক আনিয়া বেহারী বাবু দুই একটি শিকার করেন। একেই বলে যথার্থ শিকার।

ভাই বাঙ্গালী, তুমি বাহুবল হারাইয়া বেহারে আসিয়াছ। এখানে আসিয়া বুদ্ধিবল হারাইতে বসিয়াছ। আছে তোমার সম্বল দর্প। অতি দর্পে হতা লঙ্কা, অন্য পরে কা কথা। সেই জন্য বলি বেহারীকে তুচ্ছ করিও না, বেহারী এখন দৈবনলে বলী।

ভাই বেহারী, তুমি এখনও ভাই, বন্ধু, অতিথিকে অন্ন দাও, সংসারে সকলকে লইয়া একত্রে বাস কর। বাঙ্গালীর মত নিজের স্ত্রী পুত্র লইয়া থাক না। বাঙ্গালী তোমার ভ্রাতা ও অতিথি। অতিথির দোষ ধরিতে নাই।

যদি বেহারী বাঙ্গালী স্ব স্ব অবস্থা স্মরণ রাখিয়া চলেন তবে কোন গোল না হইলেও হইতে পারে। ভগবানই জানেন ভবিষ্যতে কি হইবে। তবে উত্তমের অভ্যুত্থান, অধমের পতন অনিবার্য্য।

সভাসমিতি

এখানে সভা সমিতি বড় কম নাই। সাহেবদের, বেহারীদের, বাঙ্গালীদের পৃথক পৃথক ক্লাব আছে। বেহার ল্যাণ্ড হোল্ডারস্ এসোসিয়েশন ও মস্‌লেম লীগের শাখা আছে। 'ক্লাবে' প্রত্যহ লোক যায় ও বৈঠক হয়। 'এসোসিয়েশন' ও 'লীগের' কায হয় যখন কোন সমস্যা উঠে। সাহেব ও বেহারী ক্লাবে নিঃশব্দে খেলা-ধূলা, আমোদ প্রমোদ হইয়া থাকে। বাঙ্গালী ক্লাবে তাহা হইবার যো নাই। এই ক্লাবটার নাম ভাগলপুর 'ইনিষ্টিটিউট'। ইহার সভ্য উকিল, হাকিম, প্রফেসার ও অন্যান্য গণ্যমান্য লোক। আসরটা কিন্তু উকিল ও হাকিমদের হাতে। পূর্ব্বে ইহাতে বেহারীরা যোগ দিতেন। এখনও দু' একজন বাঙ্গালীপ্রিয় বেহারী সভ্য আছেন। তবে শীঘ্রই ইহা খাঁটি 'ডোমিসাইল্ড' বাঙ্গালীর আড্ডা হইবে এরূপ আশা করা যায়। বেহারীরা এক স্বতন্ত্র ক্লাব খুলিয়াছেন ইহাতে 'ইনিষ্টিটিউটের' ও বাঙ্গালীর কিছু ক্ষতি হইয়াছে। যে দেশে আমরা বাস করিতেছি, যাহার অন্ন ধ্বংস করিতেছি, যাহার পয়সাতে নবাবী করিতেছি, সেই লোকদিগকে দূরে রাখিতেছি। তাহাদের আচার, ব্যবহার, সাহিত্য, ধর্ম্ম কিছুই শিখিতেছি না। মধ্যে মধ্যে আমরা বিদেশীদের সম্পর্কে এই সব মন্তব্য প্রকাশ করি ও আস্ফালন করিয়া বেড়াই। 'ইনিষ্টিটিউট' গৃহে বিলিয়ার্ড, টেনিস্, দাবা, পাশা ও তাস খেলা হয়। চা, লেমনেড, সোডা ও শাদা জলের ব্যবস্থা আছে। কেবল নাই বন্দোবস্ত হুইস্কির। তার বদলে চুরুট, সিগারেট ও কড়া তামাক

পাওয়া যায়। এখানে বৃদ্ধেরা বড় কল্‌কে পান না। এটি সহরের যত বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও উন্নত যুবাদের মজ্‌লিস বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

এখানে আসিবার ২।৩ দিন পরেই এক বন্ধু আমাকে 'ইনিষ্টিটিউট' দেখাইতে লইয়া গেলেন। যাইবামাত্রই চাঁদার বই আমার সম্মুখে আসিল। দেখিলাম অনেকের চাঁদা 'ইনিষ্টিটিউটের' জন্মাবধি বাকি পড়িয়া আছে। তবুও নামটি আছে। ভাবিলাম সই করিয়া রাখি। দেওয়া না দেওয়া ত আমার হাত।

এই ইনিষ্টিটিউটে জগতের সমস্ত শুভ অশুভ বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে। কেহ ইংরাজীতে, কেহ সংস্কৃতে, কেহ বাঙ্গালাতে এবং অধিকাংশ সভ্য দু'তিন ভাষা মিলাইয়া বুক্‌নি ঝাড়েন। সময়টা জলের মত কেটে যায়। যাহার কিছু কায নাই, তাহার বড়ই সুবিধা। এখানে অনেকক্ষণ বসিলে ও কথা কহিলে পেটের গোলমাল ও ডিস্‌পেপ্‌সিয়া থাকে না। ক্ষুধা বাড়ে ও পরমায়ু বৃদ্ধি হয়।

ইনিষ্টিটিউটের কর্ত্তৃত্ব তিনজন লোকের হাতে। আচার ব্যবহারে যতদূর বোঝা যায়,—রুল টুল পড়িয়া বলিতেছি না; তিনজনের মধ্যে একজন ৭॥০ ফুট, একজন ৫॥০ ফুট ও একজন ৪॥০ ফুট। একজন শ্যাম, একজন উজ্জ্বল শ্যাম ও একজন গৌর। শ্যামের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। মুখে সদাই বাঁশী। উজ্জ্বল শ্যাম ও গৌরের মুখে সদাই হাসি মিষ্ট কি কাষ্ঠ—বলিতে পারি না। যখন কোন তর্ক উপস্থিত হয় তখন শ্যামের বংশীবাদনে ও কণ্ঠের স্বরে সকলেই

মন্ত্রমুগ্ধ হন। এই তিনজন মেম্বরকে আমি বড় ভয় করি। ঠিক কথা বলিতে গেলে 'ইনিষ্টিটিউট' গৃহে অভিনন্দন ও বিদায় উপলক্ষে মধ্যে মধ্যে জলযোগ হয়। এসব কাজে যোগদান করিতে আমার আলস্য ও ভুল হয় না। তবে প্রত্যহ যাওয়া ঘটিয়া উঠে না। একজন হাকিমের পদোন্নতি ও স্থানান্তর উপলক্ষে 'ফেয়ার ওয়েল' দেওয়া হয়। পয়সা খরচ কার জানিতে ইচ্ছা হইল। উকিল ভায়ারা বলিলেন "হাকিমের নম্বর অসংখ্য; বদলি লাগিয়াই আছে। সুতরাং আমরা এক পয়সা দেই নাই।" হাকিমের দুই এক ভ্রাতা বলিলেন "আমরা দিয়াছি।" এত ভালবাসার কথাটা সহজে বিশ্বাস হইল না। অনেক চিন্তা করিয়া ঠিক করিলাম হাকিম বাবু লোক বড়ই ভাল। কারণ এ বিদায় কেউ তাঁহাকে দেয় নাই। তিনি নিজেই পয়সা খরচ করিয়া বিদায় লইলেন, এই মাত্র।

সঙ্গীতের একটু চর্চ্চা ভাগলপুরে হয়। একটি সঙ্গীত সমাজও আছে ১১।১২ বৎসরের একটি বাঙ্গালী মেয়ে অনেক কালওয়াতের উপর যায়। ইনিষ্টিটিউটে ও সঙ্গীতসমাজে মধ্যে মধ্যে গান হয়। একজন মেম্বর দিগ্‌গজ গায়ক। তাঁর নাম দেশ বিদেশে রাষ্ট্র হইয়াছে। 'ইনিষ্টিটিউটে' এর কিন্তু কদর কম। খেয়াল ধ্রুপদ যখন ধরেন তখন মেম্বররা বেগে পলায়ন করেন।

বাঙ্গালী বেহারী মিলিয়া একটি 'বাহাদুরি সমিতি' করিয়াছেন। সভ্যের সংখ্যা আপাততঃ তিন। এক একজন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের পৃথক পৃথক অবতার। শূন্যে ইঁহাদের মিটিং হয়। জগতের সমস্ত

ভাগলপুর চিত্র

শুভ অশুভ কর্ম্মে যখন চাঁদা সংগ্রহ করিবার আবশ্যক হয়, তখন অবতারেরা ব্যোমযানে শূন্য হইতে মর্ত্ত্যে অবতরণ করেন। এই ত্রিমূর্ত্তি যখন চাঁদার চেষ্টায় লোকালয়ে প্রবেশ করেন, তখন মানুষের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ছলে, বলে, কলে, কৌশলে কায সারিয়া অবতারেরা নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হন। পরে লোকে হায় হায় করিতে থাকে আর স্বর্গে ইঁহাদের 'বাহাদুরির' জন্য দুন্দুভি বাজে। মর্ত্ত্যের অনেক লোকে তাহা শুনিয়াছে।

স্ত্রীলোকদের এখানে একটি সমিতি আছে। ইহাতে বেহারী স্ত্রীলোক যোগ দেন না। সমিতির মিটিং ও সিটিং প্রত্যহ হয় না। মাসে দুবার—শনিবারে শনিবারে। স্ত্রীলোকেরা পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, পুত্র-বাৎসল্য ও পতিসেবার এখনো জলাঞ্জলি দেন নাই। তাই মিটিং এত পরে পরে হয়। যখন বঙ্গ-ললনা প্রত্যহ মিটিং করিবেন তখন আমাদের দফা রফা হইবে। একের অত্যুন্নতির অর্থ অন্যের অবনতি ও সর্ব্বনাশ। স্ত্রী পুরুষের দ্বন্দ্ব অনেক দিনের। গিন্নী বলেন আমি বড়। কর্ত্তা বলেন আমি বড়। কে যে বড় ঠিক করা ভার। বোধহয় দুইজনেই বড়, যদি সামঞ্জস্য করিয়া চলিতে পারেন। সমিতিতে স্ত্রীলোকেরা সঙ্গীত, প্রবন্ধপাঠ ও স্ত্রী জাতির উন্নতি বিষয়ে আলোচনা করেন। গিন্নীরা যখন গান ও বক্তৃতা করিয়া ঘরে ফেরেন, তখন কর্ত্তাদের বুক দশ হাত হয় ও তুচ্ছ উদরের চিন্তা থাকে না। কারণ অবলার মুখের বলের কাছে কোন কিছুই খাড়া থাকিতে পারে না। সমিতির কোন কোন মহিলার লেখা আমার চক্ষুগোচর হইয়াছে, তাহাতে নয়ন

সার্থক হইয়াছে। কাহারও কাহারও সঙ্গীতের প্রশংসা শুনিয়াছি কিন্তু তাহার ধ্বনি এখনও এ কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই। যদি এই মহিলা সমিতি মোক্ষদা বালিকা বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করেন, তাহা হইলে পুরুষের অবিচার হইতে কোমলমতি বালিকারা রক্ষা পায়। বালিকার ভার মহিলার উপর দিলেই ঠিক হয়। স্ত্রীলোকে নারী চরিত্র যেমন বোঝেন, পুরুষ তেমন পারেন না। তাহার একটি সামান্য উদাহরণ দিব।

এদেশের বেহুলা পূজায় স্কুলের ছেলেরা Half Holiday পায়। মোক্ষদা বালিকা বিদ্যালয়ের মেয়েরা কিন্তু এক ঘণ্টারও ছুটি পায় না। এ সমস্ত পূজা ও ব্রতে মেয়েদের স্থান প্রথম। নির্ম্মম পুরুষেরা তাহা কৈ বোঝেন?

পরিশেষে বক্তব্য, এই নক্সাতে ন্যায় ধর্ম্ম ও সত্যের অবমাননা না করিবারই চেষ্টা করিয়াছি। মাঝে মাঝে রঙ ফলাইয়াছি মাত্র। সহৃদয় ও রসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই একথা বুঝিবেন, আশা করি। অজ্ঞাতসারে যদি কাহারও অন্তঃস্থলে কোন আঘাত দিয়া থাকি, তাহার জন্য করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করি।

অগ্রহায়ণ, ১৩২৩

গয়া ও বুদ্ধ গয়া ভ্রমণ

গত নভেম্বর মাসে E. I. Ry. কোম্পানীর ইতিহাসে এক নূতন Chapter আরম্ভ হয়। ১লা নভেম্বর রাত্রি ৯টা ১০ মিনিটে সাধারণ লোকের সুবিধার জন্যে এই কোম্পানী একখানি Second Class Tourist's Special ট্রেন ছাড়েন। আমার জ্ঞানে এরূপ ট্রেন সাধারণ লোকের জন্য, পূর্ব্বে আর কখন ছাড়ে নাই। এই সুযোগে আমি এই ট্রেনে আশ্রয় লই ও অনেক নূতন নূতন স্থান দেখি।

প্রথমে গয়া ও বুদ্ধ গয়াতে আসি। আজ সেই দুই স্থানের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ লিখিলাম। অন্যান্য স্থানের কথা পরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

রাত্রি ৮টা হইতে Howrah Platform No. I এ জনতা সুরু হয়। যাত্রী অপেক্ষা দর্শকের ভিড় অধিক হইয়াছিল। সর্ব্ব-সমেত আন্দাজ ২০০জন যাত্রী লইয়া এই ট্রেন রওনা হয়। অনেক পুরুষ, স্ত্রীলোক, বালক বালিকা ট্রেন দেখিতে আসিয়াছিল। যাত্রীরা Platform এ আসিলে, একজন Railway কর্ম্মচারী তাঁহাদিগকে স্ব স্ব গাড়ীতে উঠাইয়া দেন। অধিকন্তু অনেক যাত্রী যাঁহারা সকাল সকাল আসিয়াছিলেন, এক একটি ফুলের তোড়া ও বোকে রেলওয়ে কোম্পানীর নিকট হইতে উপহার পাইয়াছিলেন।

যে গাড়ীতে আমি স্থান পাইয়াছিলাম, তাহাতে আর ৪ জন

ছিলেন। প্রত্যেকের ভাগে এক এক খানি বেঞ্চি। তবে কাহারও ভাগ্যে নীচের ও কাহারও ভাগ্যে উপরের। আমার কপালে একখানি নীচের বেঞ্চি জুটিয়াছিল। প্রত্যেক আরোহীর ভাড়া ১০০৲। ইহার মধ্যে খাই খরচ ও স্থানে স্থানে টাঙা ও বাস্‌এ ভ্রমণের ব্যবস্থা ছিল।

গয়া পৌছিতে সকাল হল। ঘুম হইতে উঠিয়াই দেখি, চা, টোষ্ট, অমলেট্ ও ফল লইয়া Boy হাজির। দিল্লীর কপুর কোম্পানী আমাদের Caterer। প্রাতরাশ না খাইয়াই সকলের সঙ্গে সহর দর্শনে বাহির হইলাম। আমার সাহেবী পোষাক ছিল। আর ক'জনে ধুতি ও কোট পরিয়া চলিলেন। গয়া ষ্টেসন হইতে বাহির হইতে না হইতেই, গয়ালী পাণ্ডারা পিছু লইল। পোষাকের জন্য আমাকে আক্রমণ করিল না। দেশী পোষাকে যে সব বাবুরা ছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে পাণ্ডারা ছুটিল। একজন বাবুর দুর্দ্দশা দেখিয়া আমার কান্না পাইল। পাণ্ডারা ধরিয়া দস্তুর মত টানাটানি সুরু করিল। একজন হাত, একজন কোট, এক জন কাপড় ধরিয়া তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। বাবুর তখন বেশ একটু ভয় হইয়াছে। 'হুঁ' কি 'না' কিছুই বলেন না। যখন পাণ্ডাদের আক্রমণের মাত্রা বেশ বৃদ্ধি হইল, তখন আমি একজন রাস্তার Constable কে ডাকিলাম। সে আসিয়া পাণ্ডাদের ধমক দিল। তবে বাবু পাণ্ডাদের হাত হইতে উদ্ধার পাইলেন। এ ত একটি সামান্য উদাহরণ। এরূপ শত শত কাণ্ড ও গুরুতর ব্যাপার অহরহ আমাদের তীর্থস্থানে হইতেছে! কেবা তাহার প্রতিকার করিতেছে?

গয়া ও বুদ্ধ গয়া ভ্রমণ

গয়া সহর মশা, মাছি, গরম ও গর্দার জন্য প্রসিদ্ধ। রাস্তা ঘাটের শ্রী ছাঁদ নাই। সহরের আশে পাশে ড্রেন। তাহার সুগন্ধে সহর মস্‌গুল! নভেম্বর মাসে এখানে যে গরম ভোগ করিয়াছি তার কথা এখনও ভুলিতে পারি নাই। এ সহরে দ্রষ্টব্যের মধ্যে এক, বিষ্ণু পাদ মন্দির,—দুই, ব্রহ্মযোনি পাহাড়, তিন,—বুদ্ধ গয়া।

পুণ্যের জোরেই বলিতে হইবে, এ তিন তীর্থের দর্শন লাভ হইয়াছিল।

আমার গুরুজনের মধ্যে প্রায় সকলেই স্বর্গগত। বাবা, মা, দাদা, ঠাকুরদা, ঠাকুরমা ও শ্বশুর মহাশয় কেহই ইহলোকে নাই। অনেকদিন হইতে বাসনা ছিল যে একবার গয়ায় গিয়া এই সমস্ত গুরুজনের প্রীত্যর্থে পিণ্ড দান ও সেই সঙ্গে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিব। সুতরাং এ সুযোগ ছাড়িতে পারিলাম না। এক বন্ধুর সাহায্যে পুরোহিত ঠিক হইল। তিনি বাঙালী ব্রাহ্মণ। এদেশে অনেক দিন হইতে আছেন। কাণে কম শোনেন কিন্তু কাজে বিচক্ষণ। গয়াতে পিণ্ডদানের ব্যাপার হয় ত অনেকের জানা নাই। সংক্ষেপে তাহার আভাষ দিলে সাধারণের কিছু উপকার হইতে পারে।

গয়ালী পাণ্ডাদের এক পাড়া আছে। সেখানে একা যাইতে ভয় করে। পিণ্ড দান করিতে হইলে সেখানে যাইতেই হয়। আমি যখন সেখানে গিয়াছিলাম, তখন আমার নগ্ন পা ও ধুতি চাদর পরা। আমাকে দেখিবামাত্র কে আপনার পাণ্ডা, কোথায় যাচ্ছেন, কষ্টে পড়বেন, এসব বলিতে বলিতে ১০।১২ জন পাণ্ডা

আমার পশ্চাতে আসিতে লাগিল। বুদ্ধির দোষে বা গুণেই হউক কাহারও কোন কথার উত্তর না দিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিতে লাগিলাম। সঙ্গে আমার বন্ধুর এক চাপ্‌রাশি ছিল। একলা হইলে হয় ত বিপদেই পড়িতাম।

পিণ্ড দান কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ফল্গু নদীতে স্নান করিলাম। স্নান করিয়া পট্ট বস্ত্র পরিধান করিয়া ঘাটের উপর পিণ্ড দান করিতে বসিলাম। ভট্টাচার্য্য মহাশয় মন্ত্র পড়াইতে লাগিলেন। পাণ্ডারা খুব গোল সুরু করিল, আমি বড় এতে বিরক্ত হই। নিষেধ সত্ত্বেও পাণ্ডারা গোলমাল বন্ধ করে নাই। তাহাদের এই নির্ম্মম ব্যবহারে মনে বড় ব্যথা পাইয়াছিলাম। কিন্তু নিরুপায়। আমার খাতিরে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ২।৩ বার নিষেধ করিলেন। কিন্তু কোন ফল হইল না। পাণ্ডাদের এরূপ ব্যবহারের অর্থ বোধহয় বুঝাইবার আবশ্যক নাই। আমি কেন তাহাদের কাহাকে না লইয়া ভট্টাচার্য্যকে লইলাম—এই তাদের আক্রোশের কারণ। ফল্গুতে পিণ্ড দানের পর আমি বিষ্ণু পাদ মন্দিরে গিয়া বিষ্ণু পাদপদ্মে পিণ্ড দান করি। সেখান হইতে অক্ষয় বটতলে 'অক্ষয়' মান্সার্থে গিয়া পিণ্ড দান করি। প্রেতশীলায় আমাকে যাইতে হয় নাই। কারণ আমার মৃত গুরুজনের মধ্যে কাহারও অপঘাত মৃত্যু হয় নাই। পিণ্ডদান শেষ হইলে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় কার্য্যের 'সুফলের' জন্য আমাকে মাধব লাল ঢেড়ী পাণ্ডার নিকট লইয়া গেলেন। ঠাকুরের বয়স ৩০।৩৫। সিংহাসনে উপবিষ্ট। আমি গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার পদতলে ৫৲ টি টাকা রাখিলাম। আর

তিনি বলিলেন "কার্য্য সুসম্পন্ন"। যদি হইয়া থাকে ত ভালই, কিন্তু মন আমার এই কথা মানিল না। আমি ত অল্পেই 'সুফল' পাইলাম। এই "সুফলের" জন্য পাণ্ডাদের হাতে কত নরনারীর যে দুর্দ্দশা হয় তাহার কথা অনেকে জানে না। "সুফল" পাইয়া ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে আসি। সেখানে ব্রাহ্মণ ভোজন দক্ষিণা দান ও প্রসাদ গ্রহণ করিয়া সশরীরে স্বস্থানে ফিরিয়া আসি। যে ভক্তি ও শ্রদ্ধা লইয়া পিণ্ড দান করিতে গিয়াছিলাম, তাহার অর্দ্ধেক পাণ্ডাদের আচার-ব্যবহারে অন্তর্হিত হয়। যদি আমার ভাগ্যে বাঙালী ভট্টাচার্য্য না জুটিতেন, তাহা হইলে বোধহয় পিণ্ড দান না করিয়াই ফিরিতে হইত।

পিণ্ড দানে আমার মোট খরচ হয় ২৮৲ টাকা। যথা—

বিষ্ণু পাদে প্রণামী	১৲
সুফল	৫৲
বস্ত্র ও দ্রব্যাদি	১১৲
ব্রাহ্মণ ভোজন	৫৲
পুরোহিত দক্ষিণা	৫৲
ভোজন দক্ষিণা	॥৵০
ভিখারী	।৵০
মোট—	২৮৲ টাকা।

বিষ্ণু পাদ মন্দিরে যে সব প্রস্তর মূর্ত্তি দেখিলাম, তাহার অধিকাংশ বৌদ্ধ যুগের বলিয়া বোধ হইল। কেহ কেহ বলেন,

যে বিষ্ণু পাদে আমরা পিণ্ড দান ও প্রণাম করি, তাহাও বুদ্ধ পাদ-পদ্ম। আমরা তর্ক করিতে এখানে আসি নাই। সামান্য একটু ভক্তির প্রেরণায় পিণ্ড দান করিতে আসিয়াছি। বিষ্ণুই হউন আর বুদ্ধই হউন আমাদের নিকট দুই-ই সমান পূজার্হ। তাঁহাদের নিকট এই ভিক্ষা—যেন পিতৃপুরুষেরা আমাদের পিণ্ড দান ও শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করেন।

ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের ৪১৭টি ধাপ্। বেলা ১০ টার পরে রোদ্ যখন বেশ কড়া হইয়াছে, তখন সকলে পাহাড় চড়িতে আরম্ভ করি। যে সব যুবক আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তাঁহারা আমার ও আমার সমবয়স্ক আর একজন বৃদ্ধের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। উদ্দেশ্য অবশ্য সৎ ছিল। যদি আমরা পড়ি কি মরি তবে তাঁহারা আমাদের First Aid দিবেন। বয়স আমার ৬১ ও অন্যের ৬৩। সুতরাং প্রচণ্ড রৌদ্রে এত কসরৎ বোধহয় উচিত হয় নাই। ভগবানের কৃপায় আমাদের Sunstroke কিম্বা হার্ট ফেল হয় নাই ও আমরা ধরাশায়ী হই নাই। তবে মাঝে মাঝে বসিয়া দম লইতে হইয়াছিল। পাহাড় চড়িবার নিয়ম আস্তে আস্তে চড়া। জোরে উঠিতে গেলেই বিপদ হইবার সম্ভাবনা। উঠিতে ও নামিতে ১ ঘণ্টার কিছু উপর সময় লাগিয়াছিল। উঠিবার সময় যে কষ্ট হইয়াছিল, নামিবার সময় তাহার অর্দ্ধেকও হয় নাই। হড়, হড়্ করিয়া নামিয়া পড়িলাম। তবে একটু গড়াইবার ভয় ছিল। শরীরটা একটু স্থূল বলিয়া Gravitation তত কায়দা করিতে পারে নাই।

বুদ্ধ গয়ার পথ ফল্গু নদীর ধারে ধারে। গয়া সহর হইতে

৭ মাইল। আজ বৈকালে বিহার উড়িষ্যার গভর্ণর বুদ্ধ গয়া দর্শনে যাইবেন। সুতরাং পথ ঘাট সব পরিচ্ছন্ন ও সজ্জিত। বুদ্ধ গয়ার মন্দির এক মহান্ত মহারাজের হাতে। সরকারের তরফে একজন ইঞ্জিনিয়ার মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ করেন। এখানে যে কেহ আসেন, তাঁহাকে পুলিশের নিকট আগে নামধাম দিতে হয়। মহান্ত মহারাজ হিন্দু। অনেক দিন হইতে বৌদ্ধেরা এই মন্দির দখল করিবার চেষ্টায় আছেন কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হন নাই।

দূর হইতে মন্দিরের চূড়া দেখিতে পাইলাম। মন্দির ২০৪ ফিট উচ্চ। প্রস্তরে নির্ম্মিত। মন্দিরের কারুকার্য্য দেখিতে দেখিতে নয়ন ও মন মোহিত হয়! কাণে শুনিয়া অনেক বস্তুর সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায় সত্য, কিন্তু যখন তাহা নয়ন গোচর হয় তখন তাহার এক নূতন প্রভাব আমাদের উপর আসিয়া পড়ে ও কত পুরাতন কথাই মনে উদয় হয়! কত শত সহস্র বৎসর আগে এই মন্দির উঠিয়াছে। মনে হয়, কি বিরাট্, কি মহান, কি সুন্দর! বুদ্ধ দেবের নানা ভাবের মূর্ত্তি প্রস্তরে খোদিত। মন্দিরের আশে পাশে যেন তিনি এখনও সমাধিস্থ! অনেকে বলেন, এই মন্দির হইয়াছিল সম্রাট অশোকের সময়ে। অশোকই হউন বা অন্য কেহই হউন এই মন্দির যিনি করিয়াছিলেন, তিনি ধন্য। এমন 'মেমোরিয়াল' না হইলে কি জগদ্বিখ্যাত বুদ্ধদেবের উপযুক্ত হইত! যে যুগে বুদ্ধদেব এ শাপগ্রস্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে যুগের পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে জ্ঞানের আলোক আসিয়াছিল। বৌদ্ধ সভ্যতা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার জ্ঞান বিকাশের শেষ অধ্যায়

মাত্র। আজ চক্রবর্ত্তী অশোকের বা বৌদ্ধ যুগের কতটুকুই বা আমরা জানিতে পারিয়াছি! তবে যৎ সামান্য যাহা কিছু পাইয়াছি তাহাতেই বুঝিতে পারি যে সে যুগে ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পের কত উৎকর্ষই হইয়াছিল! এই মন্দির সেই বৌদ্ধ যুগের সভ্যতার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তাই এই মন্দির আমাদের নিকট এত প্রিয়। এক কথায় বলিতে গেলে, এমন যুগ, এমন অবতার ও এমন স্মৃতিচিহ্ন জগতে বড়ই দুর্ল্লভ।

যে বটবৃক্ষের তলে রাজকুমার শাক্যসিংহ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধ নামে অভিহিত হন, সে গাছ এখন নাই। তবে সেইস্থানে সেই বৃক্ষের সন্তান সন্ততি জন্মিতেছে ও বর্ত্তমান আছে। এখন যে সন্তানকে দেখিলাম, তিনি খুব প্রাচীন নন। এই বৃক্ষের নামকরণ হইয়াছে 'বোধিদ্রুম' সাধারণতঃ লোকে জানে ইহা বটবৃক্ষ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এটী বট নয়, অশ্বত্থ। চীন, বর্ম্মা ও সিংহল দেশের লোক এই বৃক্ষের পাতা পূজা করেন। তাঁহাদের যে কেহই আসেন, তিনি অন্ততঃ একটী পাতা লইয়া যাইবেন। আমিও একটি পাতা লইতে ছাড়ি নাই। যে মহাপুরুষ অহিংসা মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ গুরু, তাঁহার স্মৃতি জড়িত সামান্য বস্তুও আমাদের পূজার্হ।

পূর্ত্ত বিভাগের আফিসের সন্নিকটে অনেক প্রস্তর ফলক ও মূর্ত্তির ছোট খাট একটি Museum আছে। ইহার মধ্যে সিংহলের বৌদ্ধ পুরোহিত ধর্ম্ম-পালের আনীত শ্বেত প্রস্তরের এক সুন্দর বুদ্ধ মূর্ত্তি রক্ষিত আছে। মন্দিরে এ মূর্ত্তি স্থান পায় নাই। জাপান হইতে

আর এক মূর্ত্তি আসিয়াছিল। তাহা কলিকাতায় বৌদ্ধ বিহারে প্রেরিত হইয়াছে। মনে করিয়াছিলাম, অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষুর সহিত সাক্ষাৎ হইবে। আমাদের ভাগ্যে মাত্র একজনের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়। তিনি সুদূর চীনের। এখানে দর্শকের সুবিধার জন্য একটি Rest house আছে। পালি ভাষা জানা থাকিলে প্রস্তর ফলকের উপর যে সব Inscription আছে তাহা পড়িতে পারিতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার ভাষা বিদ্যা ততদূর অগ্রসর হয় নাই।

যে অহিংসা মন্ত্র ভারতের ইতিহাসের অতি প্রাচীনকালে ভগবান বুদ্ধদেব প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা এখন লুপ্ত প্রায়। এত শত শত বৎসর পরে কোথায় অগ্রসর হইব—না পশ্চাৎপদ হইয়া বসিয়াছি! আমাদের দেশের এই দুর্দ্দিনে কায় মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যেন ভগবান বুদ্ধদেব আবার আমাদের মধ্যে আসিয়া সেই অহিংসা মন্ত্রে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ক্রিশ্চান, সকলকেই দীক্ষিত করেন। ভাই ভাইএর মধ্যে যেন আর হিংসা দ্বেষের লেশ মাত্র না থাকে। এই আমার ভিক্ষা, এই আমার প্রার্থনা। এই মন্ত্র যেন শেষ জীবনের লক্ষ্য করিতে পারি। ভগবান বুদ্ধদেবের চরণে প্রণিপাত করি ও বলি, তিনি যেন আমার কামনা সফল করেন।

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া গাড়ীতে ফিরিতে বেলা দেড়টা বাজিয়া গেল। স্নানের পর রেষ্টুরেণ্টকারে খাইতে গেলাম। ভাত, ডাল, ২।৩ রকমের ভাজা, মাংস ও দই মিলিল। মাংস

বাদ দিয়া সব খাইলাম। রান্না ভাল। যিনি যতবার চাহিয়াছেন তিনি ততবার পাইয়াছেন। এক এক জন /১ সের /১॥ সের মাংসই খাইয়াছে—বেশ লাগিতেছে। এক দিনের মধ্যেই সংসার পাতিয়া বসিয়াছি। মধ্যে মধ্যে রেলের অফিসার মিষ্টার চৌধুরী আসিয়া আমাদের খোঁজ খবর লইতেছেন ও আমরা তাহার তারিফ করিতেছি।

বৈকালে চা, কেক ও আপেল দিয়াছিল। চা খাইবার পরে বেড়াইতে যাই—Railway Colonyর দিকে। বেশ পরিষ্কার ও সুন্দর। সকালে সহরের গর্দ্দাতে নাক, চোখ, মুখ ভরিয়া গিয়াছিল। বৈকালে আর তাহার সাধ ছিল না। আমরা দুই বুড়োতেই বেড়াই। যুবকেরা মিশিতে চাহে না। বুড়ো হওয়া বড় বিপদ। ঘরে, বাহিরে সকলেই পাশ কাটাইয়া চলিতে চায়।

বেড়াইয়া আসিবার পর রাত্রি ৯টার সময় ডিনার খাই। ডিনারে ছিল রুটি, চাপাটি, লুচি, ভাত, ডাল, মাছের কারি ও কিসমিসের রাউতা। খাওয়া দাওয়া করিয়া শুইয়া পড়িলাম। কালরাত্রে ভাল ঘুম হয় নাই। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র সংসারে এই নিশীথে হঠাৎ বুড়ো দাদার বিরহ সুরু হইল। ঘুম আর আসে কি ক'রে? পর পর ২টি স্ত্রীর মাথা খাইয়া এখন তিনি তৃতীয় সংসার করিয়াছেন। তাঁহার কথায় বলিতে গেলে, তেতলার উপর না শুইলে তাঁহার ঘুম হয় না। গাড়ীর ভিতর, শুষ্ক বেঞ্চির উপর শয়ন করিয়া তিনি বিরহ-জ্বরে ছট্‌ফট করিতে লাগিলেন। আমরা ক'জন সহযাত্রী তাঁহার বিরহ অগ্নিতে অল্প অল্প বাতাস

দিতে লাগিলাম। তখন তিনি শয্যা পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া করুণ স্বরে গাহিতে লাগিলেন,—

"তোমার বিরহে সই, রোচে না কো লুচি বই"

কারণ তিনি রাত্রে ভাত, রুটি, চাপাটি সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া লুচিরই শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন।

আজ এই পর্য্যন্ত।

আষাঢ়, ১৩৩৬

বৃদ্ধের শৈল বিহার

অনেক দিন হইতে লোকের মুখে, সংবাদপত্রে ও মাসিক পত্রিকার স্তম্ভে, শিলংএর তারিফ্ শুনিয়া আসিতেছি। কেউ বলেন, Hill Stationর Queen হচ্ছেন শিলং। কেউ বলেন, ইনি প্রকৃতি দেবীর অতি প্রিয়তমা কন্যা। কেউ বলেন, বন, জঙ্গল, পাহাড়, জল, ফল, ফুল, সবুজ ঘাস ও গাছের এমন একত্র সমাবেশ অন্যত্র দুর্ল্লভ। বড় বড় সরকারী অফিসারেরা বলেন যে, Plainর ভীষণ গরমে যখন মস্তিস্ক বিকৃত হয় ও কোন কাজ করা যায় না, তখন শিলংএ আসিলে সদ্য উপকার হয় ও কাজ কর্ম্মের অনেক সুবিধা হয়। প্রাচীন ডাক্তারেরা বলেন, শিলংএর পাইনের হাওয়াতে সকল রোগ দূর হয়। বৃদ্ধের যৌবন ফিরিয়া আসে ও মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়।

এই সমস্ত শুনিয়া আমার মত বৃদ্ধেরও লোভ হইল। এতদিন সময় ও পয়সার অভাবে শিলং দেখা হয় নাই এখন ভগবানের কৃপায় ঐ দুটির বিশেষ অভাব নাই। সুতরাং শ্রীদুর্গা বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। E. B. R কোম্পানী নোটিশ দিয়াছেন যে, নগদ ৪৭৲ টাকাতে শিয়ালদহ হইতে Upper Classএ যাত্রীদিগকে শিলং লইয়া যাইবেন ও ৭ দিন পরে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরাইয়া দিবেন। অবশ্য খাই খরচটা যাত্রীরা নিজের পকেট হইতে চালাইবে। টাকার মমতা ছাড়িয়া দিয়া ১ খানি টিকিট কিনিয়া ফেলিলাম। ১৮ই মে, ১৯২৯ শনিবার বেলা ১২৷৷৹টার Assam

Mail ট্রেনে এক Second Class Compartmentএ স্থান পাইয়া, অনেক আশা বুকের ভিতর লইয়া রওয়ানা হইলাম। আমার Compartmentএ আর তিনজন মারওয়াড়ী যাত্রী ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে বেশ গল্প সল্প চলিতে লাগিল। তবে বেশীর ভাগই টাকা রোজগারের কথা। তাঁহাদের এক বর্ম্মন বন্ধু একটি শ্যামা তন্বী সুন্দরী সঙ্গিনী সঙ্গে আনিয়াছিলেন। বর্ম্মন বাবু ও তাঁহার সঙ্গিনী আমাদের পরবর্ত্তী কামরায় ছিলেন। মারওয়াড়ী বাবুরা ঘন ঘন সেই কামরায় যাতায়াত করিতে লাগিলেন। সুন্দরী স্ত্রীলোকের মান সর্ব্বত্র। অনেকেই নজর দেন। সুতরাং আমি মারওয়াড়ী বাবুদের বিশেষ দোষ দিতে পারি না। যাহা অহরহ ঘটিতেছে, ঘরে, বাহিরে, বাজারে, পথে, ঘাটে ও রেলওয়ে ষ্টেশনে, তাহা ত চক্ষের উপর রহিয়াছে। যাক্ এ কথা লইয়া আর বেশী তোল্‌পাড়্ করা আবশ্যক মনে করি না। ট্রেনে রেষ্টুরেণ্ট Car ছিল। সেদিন দারুণ গরম। বরফ, মিষ্টি জল, নোনা জল, শাদা ও লাল জলের অভাব ছিল না। যখনই যাহা চাহিয়াছি, তখনই তাহা পাইয়াছি। তবে বিনা পয়সায় নয়। বেলা ৪॥০ টার সময় চা ও বিস্কুট খাইতে পাই। পথে যাইতে যাইতে পদ্মা নদীর সারা Bridge দেখি। একটা Bridge বটে। Engineering বিদ্যার দৌড় তখন কিছু কিছু বুঝিতে পারি। সন্ধ্যা ৮টার সময় পার্ব্বতীপুর ষ্টেশনে পৌছি। এখানে বড় লাইন ছাড়িয়া মিটার গেজ লাইনের গাড়ীতে চড়িতে হইল। সে গাড়ীতে প্রত্যেক আরোহীর জন্য একটি একটি Berth Reserved ছিল।

আমার কপালে, উপরের একটি Berth ভাগে পড়িয়াছিল। অনেক অনুরোধের পর নীচের একখানি বেঞ্চি বদলে মিলিল। সকাল হইল Rangia ষ্টেশনে। তখন বুঝিলাম, বাংলা দেশ পার হইয়াছি। লোক-জনের বেশ ভূষা, হাব ভাব, কথা বার্ত্তা সকলই পৃথক। প্রকৃতির চেহারাই স্বতন্ত্র। রেলের দুধারেই বিস্তৃত মাঠ। জলে জলাকীর্ণ। রাস্তা ঘাট কাদাতে ভরা। এখন বাংলাদেশে লোকে গরমে সিদ্ধ হইতেছে। সেখানে বৃষ্টির নাম নাই। ক্ষেত সব ফাটিয়া যাইতেছে। আর এখানে এর মধ্যেই বর্ষা বেশ সুরু হইয়া গিয়াছে ও নদীতে বাণ আসিয়াছে। মনে হইল Monsoon সজোরে আসামে আসিয়াছে। মাটির রংটা কি কাল! এমন কালরূপ ত পূর্ব্বে দেখি নাই।

রবিবার সকাল ৭৷৷৹টার সময় আমিন গাঁ ষ্টেশনে পৌঁছিলাম—ব্রহ্মপুত্রের এক কিনারাতে। নামিয়া ষ্টীমারে চড়িয়া নদী পার হইলাম। ষ্টীমারে ছোট হাজ্‌রী খাইলাম। খুব বেশী নয়, কিন্তু ফ্রেম্‌জি কোম্পানী কানটি মলিয়া ১টি টাকা উশুল করিয়া লইলেন। নদী পার হইয়া পাণ্ডুতে আসিলাম। এখন আমাদের জন্য আর রেলগাড়ীর নাম গন্ধ নাই। মোটরে কি Busএ ৬৮ মাইল পথ যাইতে হইবে। বন্দোবস্ত স্বতন্ত্র। মালপত্র ওজন হইয়া Busএ উঠিল। দক্ষিণা ১৷৷৹ টাকা লইল, মাত্র আধ মণের উপর। তার পর Railway Company কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত ও Commercial Carrying কোম্পানী দ্বারা চালিত Motor Carএ আমরা ৫৩ জন যাত্রী চড়িলাম। Driver বেশ দক্ষ বলিয়া মনে হইল।

কামাখ্যা ও গৌহাটী পার হইয়া গাড়ী ১৬।১৭ মাইল গিয়া পাহাড় ও জঙ্গলের রাজ্যে প্রবেশ করিল। কি সুন্দর জঙ্গল, পাহাড় ও আঁকা বাঁকা রাস্তা! পাহাড়ের গায়ে গায়ে রাস্তা। মধ্যে মধ্যে এক দিকে পাহাড় ও আর এক দিকে অতল খাদ। যদি দৈবক্রমে গাড়ী একটু পথভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলেই অক্কা। প্রাণ হাতে লইয়া ভয় চাপিয়া যাইতে লাগিলাম। ভাগ্যের জোরেই বলিতে হইবে অধিক সময় এ সব ভাবনা চিন্তা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কারণ প্রকৃতি দেবী তাঁহার যে সুন্দর রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য আমাদিগকে দেখাইতে ছিলেন, তাহাতেই তন্ময় হইয়াছিলাম। বুঝি এমনটি পূর্ব্বে আর দেখি নাই। এ সব লিখিয়া প্রকাশ করা একটু শক্ত। সে শক্তি আমার নাই। সুতরাং চোখে দেখা দরকার। যদি কাহারও নিখুত বিবরণ পড়িয়া লোকে ক্ষান্ত হয়, তবে দুধের সাধ ঘোলে মিটান হইবে।

পাণ্ডু শিলংএর অর্দ্ধেক পথে নংপো গাঁ। সেখানে ডাকবাংলা ও অনেক দোকান আছে। ডাকবাংলাতে মধুর সরবৎ, মাখন, রুটি ও জেলি মিলিল। আবার এক চোট খাইলাম। আমাদের ড্রাইভার বলিল যে সে সকলের আগেই শিলং পৌছিবে। সকলকে পিছনে ফেলিয়া আগে পৌছিব এই আশাতে মনে বেশ একটু ফুর্ত্তি হইল। হায় রে মন—তোমার ভবিষ্যৎ বুঝিবার কতটুকুই বা শক্তি আছে! গাড়ী জোরে চলিতে চলিতে হঠাৎ বিকল হইল। Magneto ভস্মীভূত। আমরা য্যাকে বলি Stranded. সকল গাড়ীই আগে চলিয়া গিয়াছে। কোম্পানীর Engineer

আসিয়াছিলেন,—আমাদের বিপদ আপদে সাহায্য করিতে। কিন্তু তিনি যে কোথায় উধাও হইয়াছেন, তার কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। অবশেষে এক Busএ স্থান করিয়া লইতে হইল। কোথায় আস্‌ছিলাম বেশ রাজার হালে, কিন্তু শেষে দীন দুঃখীর মত শিলংএ প্রবেশ করিলাম। শিলং কিন্তু আমাদিগকে Right Royal Reception দিলেন। Commercial Carrying কোম্পানীর আড্ডায় পৌছিবামাত্র দেখি যে, বাবু ললিতলাল মিত্র আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। মুখের হাসি ও মনের খুসি একটু চাপিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে তিনি একখানা Taxi ডাকিয়া আমাকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁর ছেলেমেয়েরা আমাকে পাইয়া বসিল। যদি এক গেলাস জল কিম্বা একটা পান চাই, অমনি ৪।৫ জন ছুটিবে ও জল ও পান আনিবে। কোন কিছুরই অভাব বোধ করিতে দিবে না।

বিনা ভাবনা চিন্তায় ও বিনা খরচে বেশ খাইতে শুইতে লাগিলাম ও সহর দেহাত ঘুরিয়া ললিতবাবুর চাল ডাল ও আটার খরচ কিছু বাড়াইয়া দিলাম।

শিলং সহরে ও তাহার চারিদিকে অনেক কিছু দেখিবার আছে। সহরের ঘর বাড়ী, রাস্তা ঘাট, ফল ও ফুলের বাগান, ময়দান, পার্ক, লেক্ ও পাইনের বন দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। গরমের দিনে ছোটনাগপুরের পাহাড়, জঙ্গল, মাঠ জলাশয়ের শুষ্ক ও রুক্ষ চেহারা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এই সময়ে শিলং পাহাড়ের

সজীব, সবুজ ও সুন্দর চেহারা বড়ই প্রীতিপ্রদ। ঘাসের Lawns দেখিতে কি সুন্দর! ফল, হরেক রকমের। বিলাতী ফলই বেশী ফলে—যথা আপেল, পিয়ারা, প্লম্, এপ্রিকট্ ইত্যাদি। দেশী ফল, আম লিচু নাই। কাঁঠাল, পেঁপিয়া, কলা, আনারস ও কমলা-লেবু খুব প্রচুর। জঙ্গলের মধ্যে বন্য কলাগাছ দেখিয়াছি। অন্য পাহাড়ে তাহা পূর্ব্বে দেখি নাই। যে মাসে বাঁধাকপি, কড়াইশুঁটি, পালমশাক পাওয়া যায়। ফুল দেশী ও বিলাতী প্রচুর। লোকে বলে, শিলং, ইংলণ্ড ও স্কট্‌লাণ্ডের অনেক স্থানের মত। শিলংএর লোকজন, গাছপালা, পাহাড়, পর্ব্বত ও নদী দেখিলেই বোধ হয়, যে বাংলাদেশে আমরা জন্মিয়াছি তাহা হইতে এস্থান অনেক বিভিন্ন। নিজের দেশের মধ্যে, একটু নড়াচড়া করিয়া যদি ইউরোপের কোন দেশের সজীব ছবি দেখিতে পাই,—তবে কেন ছাড়ি।

শিলং সহরের Lake, Golf Ring. Race course, Carolinc water fall. Pasteur Institute ও Roman Catholic Church দেখিবার যোগ্য। সহরের সন্নিকটে Beadon fall, Bishop's fall, Elephant fall ও তাই। এ সমস্ত দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিয়াছি। Beadon fall ও Bishop's fallর জল থেকে power লইয়া শিলং সহরে Electric light সরবরাহ হইতেছে। বৈদ্যুতিক পাখা চালাইবার দরকার প্রায় হয় না। দিনে কখন কখন হইতে পারে কিন্তু রাত্রে মোটেই নয়। ৭৫ ডিগ্রীর উপর তাপ প্রায় হয় না। চেরাপুঞ্জির এত কাছে কিন্তু

Rain fall খুব বেশী নয়। যখন বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন দিনে সময়ে সময়ে রৌদ্র হয়। শিলং সমুদ্রতীর হইতে ৪৯০৮ ফুট উচ্চে। মে মাসে একটা জামা গায়ে দিলেই চলে। রাত্রে লেপ কিম্বা Rug ব্যবহার করিতে হইত। কলের জল গায়ে দিলেই বেশ ঠাণ্ডা লাগিত তবে কন্‌কনে নয়। সহরে মশা মাছি ও ছারপোকার বালাই নেই। স্বাস্থ্য বেশ ভাল। ড্রেন এমন যে তাহাতে কোন ময়লা থাকিতে পায় না। একেবারে গড় গড়িয়ে নীচে সব ময়লা চলিয়া যায়। পথে ঘাটে বেড়াইবার সময় কচিৎ অসুস্থ লোক দেখিয়াছি। প্রায় সকলেরই টক্‌টকে লাল গাল ও স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা সকলেরই কাজে উত্তম। তাহাদের মুখে হাসি সর্ব্বদা লাগিয়াই আছে। কোন খাসিয়াকে ডাকিতে হইলে 'মামা' ও খাসিয়ানীকে 'মামী' বলিয়া সম্বোধন করিতে হয়। শিলং Khasia Jaintia Hills জেলার সদর ষ্টেশন এবং আসাম গভর্ণমেণ্টের রাজধানী। সহরটী আরও ১০০০ ফুট উচ্চে হইতে পারিত। পূর্ব্বে সেই রকম প্রস্তাবও হইয়াছিল। কিন্তু বুদ্ধির দোষেই হউক বা খরচের ভয়েই হউক, Yeadu Valleyতে সহর বসিয়া গিয়াছে। শিলং Peakএ কেবল একটী মাত্র বাড়ী আছে। তাহা Assam Government এর গ্রীষ্মাবাস। একদিন তিন বন্ধুর সঙ্গে Peakএ উঠিয়াছিলাম। চেরার রাস্তা ধরিয়া যাই। Peak পর্য্যন্ত মোটর যাইতে পারে তবে সব মাসে নয়। এই রাস্তা দিয়া চড়িলে ৭ মাইল পড়ে। পায়ে উঠিতে আমাদের ৩ ঘণ্টা লাগিয়াছিল। বড়ই শ্রান্তি বোধ করিয়াছিলাম। পথে এক খাসিয়ানের চার দোকানে জলযোগ করি। তবে

জোর পাইয়াছিলাম। কিন্তু সব কষ্ট ভুলিয়া গিয়াছিলাম যখন উপরে উঠিয়া পাইনের হাওয়া খাই, ও নীচের দিকে তাকাই। শিলংএর পাইন গাছের হাওয়া খাইতেই লোক আসে। এর হাওয়াতে অমৃত আছে সেই অমৃত পান করিয়া লোকে সুস্থ ও সবল হইয়া ঘরে ফেরে।

জেলার লোক বেশী ভাগই খাসিয়া। ইহারা পার্ব্বত্য জাতি। প্রকৃতপক্ষে, ইহারাই দেশের রাজা। গভর্ণমেণ্টের জমি খুব কম। বেশী ভাগ জমিই খাসিয়াদের। তাহারা গভর্ণমেণ্টকে কি নিজের রাজাদের Land Revenue কি Rent দেয় না। সে দেশের রাজাদের নাম 'সেম্' (Siem) আন্দাজ ১ ডজন 'সেম্' জেলাটি দখল করে। ৪।৫ শত হইতে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত এক এক রাজার আমদানী হইতে পারে। তার উপর নয়। তাহাদের দেওয়ানী ও ফৌজদারী ক্ষমতা আছে। রাজারা (Siems) সব Elected। রাজ্যের দলপতিরা (Heads of clan) রাজাকে মনোনীত করেন। Representative Government অতি পুরাকাল হইতে চলিতেছে। আভিজাত্যের নাম গন্ধ নাই। রাজ্যের প্রজারা রাজাকে কোন খাজনা দেয় না। জমি সব সাধারণ লোকের। তবে রাজা প্রজাদের নিকট হইতে মধ্যে মধ্যে ভেট্ পান। রাজার কিছু খাস জমিও আছে। জঙ্গল ও খনি সব রাজার। এখন সন্ধিসূত্রে তাহা গভর্ণমেণ্ট তদারক করেন ও রাজাকে রাজস্ব দেন। স্ত্রীলোকেরা দেশে পূজিতা ও সম্মানিতা। পর্দ্দার মধ্যে থাকে না। বেশ সহজ ভাবে পথে ঘাটে চলা ফেরা

করে। বাংলার শিক্ষিতা কি অশিক্ষিতা মেয়েদের মত আড়ষ্ট ভাব মোটেই নাই। স্ত্রী পুরুষ দুজনেরই পায়ের গোছ (Calf) বেশ মোটা। পাহাড়ের রাস্তার নীচে উপরে সর্ব্বদা চলিতে চলিতে পায়ের গোছ এই রকম মোটা হইয়াছে। পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রী-লোকেরা সুন্দরী! তবে নাক একটু খাঁদা। কিন্তু স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্য্যে ও অঙ্গসৌষ্ঠবে এ খাঁদা নাক অন্য দেশের সরল ও বাঁশীর মত নাককেও হার মানায়। মনের মানুষকে শীঘ্র বশীভূত করে।

বেশীভাগ খাসিয়া চাষ ও ব্যবসা করে। ব্যবসার মধ্যে মৌমাছি পোষা ও মধু আহরণ করা একটা। আলুর চাষ খুব বেশী। ধান কম। মকাই মন্দ হয় না। খাসিরা খুব চা খায়। আসামে প্রচুর চা হয় কিন্তু শিলংএ কিম্বা আশে পাশে চার বাগান দেখি নাই। ভাতের সঙ্গে শুঁট্‌কী মাছের তরকারী দিনে ও রাত্রে শূকরের মাংস ও মদ অনেকেই খায়। ধাতে অনেকেই ইউরোপীয় লোকদের মত। অর্থাৎ মাংসাশী ও মদ্যপায়ী। মদ মাংস ও মেয়েমানুষের লোভে খৃষ্টধর্ম্মের বেশ প্রসার হইয়াছে। তবে ইহাদের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্মভাব বড়ই কম বলিয়া মনে হয়। কাজ কর্ম্ম করিয়া খায় দায়, স্ফূর্ত্তি করে আর সময়টা জলের মত কেটে যায়। এমন স্ফূর্ত্তিবাজ লোক বাংলায় দেখি নাই। পেটের চিন্তা, ছেলেমেয়ে মানুষ করিবার ভাবনা, ইহার উপর ম্যালেরিয়া কলেরা ও যক্ষ্মা ও সর্ব্বোপরি দাসত্ব শৃঙ্খল বাংলার লোককে একেবারে কাবু ও অকর্ম্মণ্য করিয়াছে।

আমার চক্ষে খাসিদের অবস্থা আমাদের অপেক্ষা অনেক

উন্নত। যদিও লোকে তাহাদিগকে 'অসভ্য' ও আমাদিগকে 'সভ্য' বলে।

জেলার সহর আগে ছিল চেরাপুঞ্জি। (Cherapunji) ইহা শিলং হইতে ৩৩ মাইল। সমুদ্রতীর হইতে ৪৪০০ ফুট উচ্চে। আমরা একদিন শিলং হইতে মোটরে চেরা বেড়াইতে গিয়াছিলাম। পৃথিবীর মধ্যে অপর কোন স্থানে এত বৃষ্টি হয় না। এই কুয়াসা, এই মেঘ, এই রৌদ্র হইতেছে ও যাইতেছে। যেন থিয়েটারের সিন (Scene) ক্রমাগতই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আমরা ২।৩ ঘণ্টা ছিলাম। তাহার মধ্যে আকাশের এত ঘন ঘন পরিবর্ত্তন হইতেছিল যে ধাঁধার মত মনে হইতেছিল। চেরার ২।৩ মাইল দক্ষিণে (মুসমাই) mushmai falls। তাহাও দেখিয়াছি। ১০০০।১৫০০ ফুট উচ্চ হইতে পর্ব্বতের গা দিয়া নানা স্থানে বেগে জল নীচে পড়িতেছে। এখন জলের বেগ পূর্ব্বের মত নাই। গত ভূমিকম্পের পর পাহাড় সব ভগ্ন হইয়াছে ও জলের বেগ কমিয়া গিয়াছে। দৃশ্য হিসাবে ইহা বড়ই রমণীয়। water fall (জল প্রপাত) হিসাবে অর্থাৎ বিক্রমে ও গর্জ্জনে রাঁচীর Hudru fall এর সমকক্ষ নহে।

চেরার এককোণে একটা গুহা (Cave) দেখিলাম। জঙ্গলের ভিতরে কিন্তু গুহাটী বেশ বড়। খাসিয়াদের দেশে অনেক বড় বড় পাথর মাথা উঁচু করিয়া জমীর উপর দাঁড়াইয়া আছে। এসব Tomb stone কিম্বা Mouslith। চেরায় এরকম অনেকগুলি দেখিলাম। চেরার দক্ষিণে শ্রীহট্ট (Sylhet)। শ্রীহট্টের "চূণ"

প্রসিদ্ধ। এই চুণের জন্য শ্রীহট্ট হইতে Khasi Hillsএ ইংরেজের প্রথম প্রবেশ। সে আজ অনেকদিনের কথা। পরে খাসিদের সঙ্গে চুণের ব্যবসা লইয়া কলহ, দেশ আক্রমণ ও সন্ধি। আর বেশী বলিতে আমার ভয় হইতেছে। সুতরাং না বলাই ভাল।

প্রত্যাবর্ত্তনের পথে কামাখ্যা দর্শন করি। মনে করিয়াছিলাম, গৌহাটীর ডাকবাংলায় থাকিব। কিন্তু সেখানে মশার ভয়ে ও আমাদের বাঙ্গালী বর্ম্মণ সহযাত্রী ও সহযাত্রিনীর সুবিধা হইবে না বলিয়া পাণ্ডুর Dilwara flatএ আশ্রয় লই। এ এক রকম Floating Rest house। ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর flat বাঁধা আছে I. G. S. N. কোম্পানীর। ২৪ ঘণ্টা ৪ জনে থাকি। প্রত্যেকে ২৲ টাকা করিয়া বাসের জন্য দিই। খাই খরচ পৃথক। ডিনারে রুটী মুসুর ডাল ভাত ও মাংস পাই। রান্না অতি সুন্দর। মুসুর ডাল বড় ভাল লাগিয়াছিল। Charge খুব বেশী নয়। এখানে থাকিয়া কামাখ্যা, উমানন্দ ও বশিষ্ঠাশ্রম লোকে অনায়াসে দেখিতে পারে। উমানন্দ ও বশিষ্ঠাশ্রম আমাদের সময়াভাবে দর্শন হয় নাই। তবে হিন্দুর পীঠস্থান কামাখ্যা দর্শন হইয়াছে। পাণ্ডু হইতে পাহাড়ের গা দিয়া ব্রহ্মপুত্রের ধারে যে পথ গিয়াছে সেই পথ দিয়া কামাখ্যা পাহাড়ে চড়িতে একঘণ্টা লাগিয়াছিল। কামাখ্যা পাহাড়ের নীচেই ব্রহ্মপুত্র। পাহাড়ের উপর নারিকেল গাছ অনেক। কামাখ্যার জল একটু লোনা। এখানে ভগবতীর যোনি পতিত হয়। কামাখ্যার পাণ্ডাদের ব্যবহার ভাল। তবে মন্দিরে কুমারীদের জ্বালায় বিব্রত হইয়াছিলাম। ২।৩ জন হাত আর

ছাড়ে না। দ্বারবঙ্গের মহারাজ ভুবনেশ্বরীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সেই মন্দির কামাখ্যাদেবীর মন্দিরের আরও উপরে। কামাখ্যার লোকদের কথা আধা বাংলা ও আধা আসামী। পাণ্ডারা অনেকেই বাংলা হইতে আসিয়াছেন। কামাখ্যার মেয়েরা দেখিতে সুন্দরী। পাহাড়ে উঠিবার সময় ২।৪ জন নজরে পড়িয়াছিল। শুনিয়াছিলাম মেয়েরাই যাত্রীদের পরিচর্য্যা করে। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। সুতরাং কি করিয়া লোক 'ভেড়া' হয় বলিতে পারি না। 'ভেড়া' হইবার সাধ যদিও ছিল, কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধে তাহা ঘটে নাই। নিজেদের চেষ্টাযত্নের ক্রটী হয় নাই একথা হলফ করিয়া বলিতে পারি। তবে ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল না।

শিলংএর পথে, ঘাটে, জঙ্গলে সুন্দরীর ছড়াছড়ি। এক এক সময়ে ইচ্ছা হইয়াছে, কাহারও সঙ্গে দুটো মনের কথা কই এবং যাহাকে বলে একটু Flirt করি। কিন্তু তাহা হইয়া উঠে নাই। আমি নিজে Khasia বলিতে পারি না। Khasia সুন্দরীরা বাংলা ও হিন্দী জানে না। সুতরাং চক্ষুই কেবল সার্থক করিয়াছি কিন্তু মনের কথা মনেই রহিয়া গিয়াছে।

পরিশেষে এই বলিতে চাই যে শিলংএ আসিলে অরসিকেরও রস বোধ হয়। গদ্যভাব দূর হইয়া কাব্যের বাতাস লাগে। এর অবশ্য মানে নয় যে আমি ৭ দিনে 'রবি ঠাকুর' হইয়া বসিব কিম্বা তাঁহার মত কবিতা লিখিতে পারিব? তবে মনের মধ্যে যে কবিভাব সময়ে সময়ে আসে নাই, তাহা বলিতে পারি না। কেবল

আলাপে

জিবের ও হাতের জড়তার জন্য ছন্দে বন্দে কবিতা বলিয়া ও লিখিয়া ছাপাইতে পারিলাম না, এই আমার বিশেষ দুঃখ।

নিজের কথায় ত মনের কথা ব্যক্ত করা হইল না। তাই কবির কথায় বলি—

"ভাষা বিহীন অজানিতের গানে
সকাল সাঁঝে পরাণ মন টানে
কাহার বাঁশী এমন গভীর স্বরে
জানিনা আর ফিরিব কিনা
কার সাথে আজ হবে চিনা
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা।"

এই অল্প সময়ে মাত্র এক সপ্তাহে যে গালে লাল, মনে আলো, মুখে হাসি ও শরীরে বল লইয়া ঘরে ফিরিয়াছি, ইহা পুণ্যের জোরেই বলিতে হইবে! গৃহিণী যদি আমাকে Divorce না করিতেন, তাহা হইলে হয় ত আমার ছেলে মেয়েদের আবার ভাই বোন বাড়িয়া যাইত। কারণ শিলংএ দেখিয়াছি, ৫০।৬০ বৎসরের বাঙালী বৃদ্ধেরা বৎসর বৎসর বংশ বৃদ্ধি করিয়া পরম সুখে, সুস্থ শরীরে দিন যাপন করিতেছেন। অলমতি বিস্তারেণ।

ভাদ্র—১৩৩৬

স্মৃতি কথা

২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণে হরিনাভি এক গণ্ডগ্রাম। কলিকাতা হইতে ১২।১৩ মাইল। সে কালে, এই গ্রামে অনেক বিদ্বান, বুদ্ধিমান লোকের বাস ছিল। ব্রাহ্মণ কায়স্থই গ্রামে প্রধান ছিলেন। ব্রাহ্মণের ভিতর দাক্ষিণাত্য বৈদিকের সংখ্যা অধিক ছিল। এখনও তাহা আছে। যে সময়ের কথা বলিতেছি তাহা ৬০ বৎসরের আগের।

মার কাছে শুনিয়াছি আমার জন্ম হয় ১২৭৪ সালের মাঘ মাসে। ১২৭১ সালে "আশ্বিনে" ঝড় হয়। সেই বৎসর দাদা হন। ৭৩ সালে "কার্ত্তিকে" ঝড় হয়, ৭৪এ আমি হই। আমরা দুই ভাই ঝড়ের পর পর আসি। আমার জন্মের পর মার আর ছেলে মেয়ে হয় নাই। একটি বোন হইলে ভাল হইত। শুনিয়াছি আমি যখন হই তখন মার বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল। আমারও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাকি ঠিক্‌ঠাক্ হয় নাই। অনেকে আঁতুড় ঘরে ছেলে দেখিতে আসিয়া বলিয়াছিলেন এ যে একেবারে জন্তু। যখন একটু মানুষের মত হইয়া উঠিলাম, তখন আমার নাম-করণ হইল "ঝণ্টু" (জন্তুর বদলে) সেই নামেই এখনও গ্রামে পরিচিত। ভাল নাম বলিলে অনেকে আমি কে তাহা বুঝিতে পারেন না।

পাঁচ বছর বয়সের আগের কথা আমার বিশেষ স্মরণ নাই। তবে সেই সময়ের একটা কথা আমার মনে আছে। সেটা আমার ছেলেবেলার। ঠাকুরমার সঙ্গে বিবস্ত্র দেহে প্রতিদিন আমাদের

দেশের "গঙ্গা" (পুষ্করিণীতে) স্নান করিতে যাইতাম। তখন অনেকে আমার গায়ে হাত দিয়া বলিতেন "তেল তুলিয়া লইতেছি" ইহাতেই আমি কাঁদিয়া আকুল। ঠাকুরমা আমাকে বলিতেন "তেল তোলা যায় না" তখন চুপ করিতাম। মোটের উপর বুঝিতে পারিতাম যে সকলে আদর করিয়া এরূপ করিতেন। কারণ তখন আমার চেহারাটা লোকের নিকট ভালই লাগিত। রং ফরসা ও গোল বেঁটে সেঁটে গড়ন। লাফা লাফি ঝাঁপা ঝাঁপিতে তখন আমি খুব মজবুদ্।

পাঁচ বছর বয়সে কিম্বা তাহার কিছু পরেই আমার লেখা পড়া সুরু হয়। সেকালে এ কাজটা আরম্ভ হইত গুরুমশায়ের পাঠশালে। পাঠশালার উপর আমার বড় আকর্ষণ ছিল না। আমাদের মামার বাড়ী বহড়ু জয়নগরের নিকট। সেখানে ছেলেবেলায় যখন যাইতাম, দেখিতাম গুরুমশাই বড় ভয়ানক জীব। যদি কোন ছেলে কোন কারণে পাঠশালাতে না গিয়া ঘরে কি অন্যত্র বসিয়া থাকিত, খবর যাইবামাত্র গুরুমশাই দু'চার জন "সর্দ্দার পড়ো" পাঠাইয়া দিতেন। তাহারা কাঁধে পিঠে করিয়া অনেক কষ্টে, আজকাল যেমন Ambulance carএ লইয়া যায় সেইরূপ অনুপস্থিত ছাত্রকে লইয়া উপস্থিত করাইত। তখন গুরুমশাই জল বিছুটি ও বেতের সাহায্যে ছাত্রের মনে ভয় সঞ্চার করিতেন। বলা বাহুল্য এ ব্যবস্থাতে কাহারও উপকার হইত না। এই সব দেখিয়া শুনিয়া পাঠশালে যাইতে বড় ভয় করিতাম। নন্দনের কৃষ্ণধন পণ্ডিতের এক পাঠশালা ছিল, আমাদের গ্রামের নবীন

ঘোষের দালানে। প্রথমে সেইখানেই বর্ণ পরিচয় হয়। তাঁহার পাঠাশালাতে কলাপাতায় ও তালপাতায় লেখা হইত কিনা মনে নাই। তবে দালানের মেজেতে ছেলেরা কয়লা ও খড়ি দিয়া লিখিত। কিছুদিন পরে কোদালিয়ার রামকালী বাবুর আটচালাতে বাংলা স্কুল হইল। পরে সেখানে ভর্ত্তি হই। আমাদের হেড্‌পণ্ডিত ছিলেন, চাঁদপুরের ভূতনাথ ভট্টাচার্য্য, সেকেণ্ড পণ্ডিত ছিলেন কোদালিয়ার ভূবন চক্রবর্ত্তী, তাঁহার এক পায়ে গোদ ছিল। থার্ড পণ্ডিত ছিলেন চিংড়ীপোতার শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য, স্বর্গীয় দ্বারিকা নাথ বিদ্যাভূষণের কনিষ্ঠ সহোদর। তখন বিদ্যাভূষণ মহাশয় ও হরিনাভির স্বর্গীয় রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় নামজাদা পণ্ডিত ছিলেন। বিদ্যাভূষণ ও তর্করত্ন দু'জনেই কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় বাংলার বিখ্যাত সংবাদপত্র 'সোমপ্রকাশে'র Editor ছিলেন। তর্করত্ন মহাশয় বাংলার প্রথম নাটক 'বেণী সংহার' লিখিয়া বিখ্যাত হন ও 'নাটুকে' রামনারায়ণ খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

এই স্কুলে আসিবার কিছুদিন পরেই আমার পিতৃবিয়োগ হয়। আমার বয়স ৬।৭ বৎসর হইবে। তখন কিন্তু ঠিক বুঝি নাই কি নিদারুণ বজ্রপাত আমাদের মস্তকের উপর হইল! ক্রমে ক্রমে তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। স্কুলে আমাদের দুই ভায়ের জন্য 'চমৎকার' ঝি প্রতিদিন ১।২ টার সময় দুধ ও মিষ্টি আনিত। একদিন শীতকালে খাবার খাওয়াইয়া আমাদের দুজনকে সকাল সকাল স্কুল হইতে বাড়ী লইয়া গেল। বাড়ী গিয়া দেখি মা ঘরের মেঝেতে

পড়িয়া কত কি আক্ষেপ করিয়া ভয়ানক ক্রন্দন করিতেছেন। তখনও ঠিক বুঝিতে পারি নাই কি হইয়াছে। এদিকে আমার মাতামহ, দয়ালচন্দ্র সেন আমাদিগকে খেলনা দিয়া ভুলাইয়া মার নিকট হইতে লইয়া গেলেন। রাত্রে যখন মার কাছে শুইলাম, তখন তাঁর মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে আমি হাঁফাইয়া উঠিলাম! মার দুই চক্ষে এত জল দেখিলে, সন্তানের প্রাণ যে কিরূপ ছট্‌ফট্ করে, তাহা ভুক্তভোগীরাই বোঝেন। কিছুতেই আর কান্না নিবারণ করিতে পারি নাই। তাঁহার মুখের উপর মুখ দিয়া, বুকে মাথা দিয়া যতই চেষ্টা করি, ততই যেন তাঁর কান্নার বেগ বাড়িয়া যায়। তখন মনে হইল বাবার জন্য মা এত কাঁদিতেছেন। তিনি কি নাই? প্রকৃত কথা কেহই বলিতে সাহস করে না। ঠাকুরদাদাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কোন উত্তর দেন না, কেবল কাঁদেন। এই ভাবেই কিছুদিন কাটিল। মাছ খাওয়া বন্ধ হওয়াতে মনে মনে সন্দেহ হইল। যখন শ্রাদ্ধ হইল, তখন বুঝিলাম আমাদের কপাল ভাঙ্গিয়াছে। আজ আমরা পিতৃহীন। দুঃখের বিষয় যে পিতৃদেব কর্ম্মস্থান করঞ্জলি গ্রামে আমাদের সকলের অসাক্ষাতে দেহত্যাগ করেন। তিনি বৎসরে একবার কি দুইবার কিছুদিনের জন্য গৃহে আসিতেন। সুতরাং আমাদের ভাগ্যে তাঁহার সহিত অধিক কাল বাস বা ঘন ঘন সাক্ষাৎ হয় নাই। তাঁহার চেহারা আমার মনের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়; তবে ঠিক ধরিতে পারি না। মা বলিতেন আমার বড় ছেলে যতীন নাকি বাবার চেহারা পাইয়াছে। অসম্ভব না হইবারই কথা। আজকাল লোকে বাপ-



মার কত ফটো; Oil-painting ও Bust করিয়া রাখেন কিন্তু আমাদের দুরদৃষ্টে তাহা আর হয় নাই। এ আক্ষেপ যাইবার নহে। এখন মা একাধারে পিতা, মাতা, ভয়ত্রাতা ও অন্নদাতা সকলই এক সঙ্গে হইলেন। অল্পবয়স্কা বিধবার স্কন্ধে ২টী নাবালক সন্তান পড়িল। এ বড় বিষম বোঝা। বৈকুণ্ঠপুরের বাবু যাদবচন্দ্র সরকারের মধ্যম পুত্র বাবু ভূতনাথ সরকার হরিনাভিতে এক ডিস্‌পেনসারী খুলিয়াছিলেন। ডাক্তার ছিলেন, শ্রীশচন্দ্র রায়। ভূতনাথ কাকা আমার বাবার খুড়তুতো ভাই হারাণচন্দ্রের মামাত ভাই। তিনি আমাকে পুত্রের মত স্নেহ করিতেন। বলিতে কি তাঁহার স্নেহ ও ভালবাসা আমাকে বড়ই আকৃষ্ট করিয়াছিল। করঞ্জলির বাবু ব্রজকিশোর ঘোষ যেমন আমাদের ভরণ পোষণের ভার লইয়া পিতার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন ভূতনাথ কাকা তেমনি শৈশবে ও কৈশোরে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। ম্যালেরিয়ার হাত হইতে তিনিই আমাকে বাঁচাইয়া রাখেন। তাঁহার ঔষধ না খাইলে আমার জ্বর ভাল হইত না এই আমার ধারণা ছিল। শুধু তা নয়। সময়ে সময়ে আব্দার করিতাম যে তিনি নিজে ঔষধ খাওয়াইয়া দিবেন। তিনি তাহাই করিতেন।

ভূতনাথ কাকার ডিস্‌পেনসারীতে তখন হরিনাভির ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসকলের নব্য ও শিক্ষিত ভদ্রলোকের আড্ডা হইত। অনেক রকমের লোক সেখানে আসিতেন, বসিতেন ও গল্প করিতেন। মধ্যে মধ্যে আমি সেখানে যাইতাম। সেই সূত্রে অনেকের সঙ্গে পরিচিত হই। তাঁহাদের মধ্যে এখন জীবিত আছেন শ্রদ্ধেয়

(১) মতিলাল ভট্টাচার্য্য, এম-এ, (২) প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী, (৩) ডাক্তার অক্ষয় কুমার মুখোপাধ্যায় এম, বি।

করঞ্জলির ঘোষ বংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ ব্রজ বাবু, বাবার দূর সম্পর্কে মামা হইতেন ও বাবাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। সেই স্নেহে বদ্ধ হইয়া তিনি আমাদের ভার গ্রহণ করেন। তিনি, বাবার যৎকিঞ্চিৎ যাহা করঞ্জলি গ্রামে ছড়ান ছিল, সেই সমস্ত টাকা আদায় ও উসুল করিবার ভার লইয়া মাসে মাসে আমাদের ভরণ পোষণের উপযুক্ত খরচ পাঠাইতেন। সুতরাং আমাদের মৃত পিতার স্থান তিনি অধিকার করেন। যতদিন আমরা দু ভাই ছিলাম, ততদিন এই গুরুভার তিনি বহন করিয়াছিলেন। মার ইহাতে পয়সার ভাবনা চিন্তার অনেক লাঘব হয়। আজ তাঁহার কথা সমস্তই মনে হইতেছে। কি মন ও প্রাণ লইয়া তিনি আমাদের নিকট আসিয়াছিলেন। এ ভগবানের কৃপা ভিন্ন আর কি বলিব!

জেঠা,খুড়া,মামা অনেকে ছিলেন বটে কিন্তু মার বোঝা তাঁহাদের কেহই লাঘব করিতে পারেন নাই। সময়ে অসময়ে তাঁহাদের নিকট উপদেশ ও আদরের অভাব হয় নাই। কেহ কেহ আবার অনিষ্ট করিতেও চেষ্টা করিতেন। আমার জেঠা মহাশয় (বাবার স্বতাত ভাই) হঠাৎ একদিন আমাকে খেজুর রস বলিয়া তাড়ি খাইতে দেন। একটু খাইয়াই ফেলিয়া দেই। আর একদিন তিনি রাজপুরের বাজারে আমাকে সঙ্গে লইয়া যান ও সেখানে এক পতিতার বাড়িতে তাহার অল্প বয়স্কা কন্যার সঙ্গে ভাব করাইবার চেষ্টা করেন। সেখান হইতে সরিয়া পড়ি। বয়স তখন

আমার ৯।১০। এই সময়ে আমাদের বাংলা স্কুল কোদালিয়া হইতে হরিনাভিতে উঠিয়া আসে। সদরওয়ালা রায় বাহাদুর কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায়ের যে গঙ্গা (পুষ্করিণী) আছে তাহার পূর্ব্বে ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের রাস্তা। রাস্তার পূর্ব্বে মাঠ। সেই মাঠে ব্রাহ্মসমাজের উত্তরে আমাদের স্কুল স্থাপিত হয়। এখন আর তাহার কোন চিহ্ন নাই। সে সময় হরিনাভির ৪।৫ মাইল দূরে ও দক্ষিণে বারুইপুর একটী সব্‌ডিভিসন। মিঃ বি-এল্ গুপ্ত আই. সি, এস সেখানকার হাকিম। সাব ডিভিসনাল অফিসার সাদা ঘোড়ায় চড়িয়া কখন কখন রাস্তা দিয়া যাইতেন। হরিনাভিতে স্কুল উঠিয়া আসিলে আমার কাকা (বাবার খুড়তুতো ভাই) শ্রীনাথ মিত্র অঙ্কের শিক্ষক হন। তাঁহার জ্যামিতি পড়ান আমার মস্তকে আদৌ প্রবেশ করিত না। বয়স তখন দশ। ছেলেরা অঙ্ক কি জ্যামিতি না করিলে তিনি খুব রাগ করিতেন। মধ্যে মধ্যে বিরাশি শিক্কার চড়ও মারিতেন। অনেক চড় খাইয়াছিলাম কিন্তু বুদ্ধি আদৌ বাড়ে নাই। বাংলা স্কুলের ১ম শ্রেণীতে যখন উঠি তখন আমার বয়স ১১ কি ১২, সেকালে প্রথম শ্রেণীতে সীতার বনবাস (বিদ্যাসাগর) পদ্যপাঠ ৩য় ভাগ (যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়) ব্যাকরণ (লোহারাম শিরোরত্ন) পাটিগণিত (প্রসন্নকুমার বন্দোপাধ্যায়) জ্যামিতি (ব্রহ্মমোহন মল্লিক) পরিমিতি (মহেন্দ্রনাথ দত্ত) বাংলা ইতিহাস (রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়) ভূগোল (তারিণী-চরণ চট্টোপাধ্যায়) পদার্থ বিদ্যা (রসিকপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়) পড়া হইত। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিতে যাই মজিলপুরের বাংলা স্কুলে। সঙ্গে হেড পণ্ডিত মহাশয় গিয়াছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের

পিতা পণ্ডিত হারাণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে আমাদের বাসা হয়। শীতকালে পরীক্ষা ৩।৪ দিন হয়। তাহাতে উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই। কেন এমন হইয়াছিল তাহা এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই। বোধহয় বাংলা ভাষার প্রতি তেমন অনুরাগ ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বে ছিল না। তাই এই শাস্তি পাই। হারাণ পণ্ডিতমহাশয় বড় সুরসিক ছিলেন। হাসিয়া বলিয়াছিলেন "শিবনাথ চেলা ছিল এখন গুঁড়ি হইয়াছে।" অর্থাৎ ব্রাহ্ম সমাজের সামান্য সভ্য হইতে তিনি নেতার দলে প্রমোসন পাইয়াছেন। আমরা যখন বাংলা স্কুলে পড়িতাম তখন আধঘণ্টা টিফিনের ছুটি হইত। ছেলেরা তখন 'বউবসানি' 'চুকপাটি' খেলা করিত। ফুটবল ও টেনিসের নাম তখন কেহ শোনে নাই। খেলা ত দূরের কথা বাংলা স্কুলে যখন পড়ি তখন আমার মামা (মার খুড়তুত ভাই) হরিনাথ সেন, বাবার মৃত্যুর পর ইংরাজি স্কুলে পড়িবার জন্য আমাদের বাড়ী আসিলেন। তিনিই আমাদের পড়াশুনা দেখিবার কর্ত্তা হইলেন। পড়াতে তাঁর খুব মন ছিল। উমেশবাবু তখন হরিনাভি ইংরাজি স্কুলের হেডমাষ্টার ও পরে সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল হন। মামা বাবু ব্রাহ্মসমাজের সভ্যও হইয়াছিলেন, অল্প বয়সেই মারা যান। তাঁর সমাধি-স্তম্ভ ব্রাহ্ম সমাজে আছে।

রাত্রে আদৌ জাগিতে পারিতাম না। অনেকবার চোখেমুখে জল দিয়া তাঁহার নিকট পড়িতে বসিতাম। কিন্তু ঢুলিতে থাকিতাম ও তিনি মাথায় টোক্কর মারিতেন। তিনি বড় ধীর স্থির ছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে মনে বড় ব্যথা পাইয়াছিলাম। মৃত্যুর সঙ্গে

জীবনে এই প্রথম সাক্ষাৎ। কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁর শবদেহের সঙ্গে সঙ্গে শ্মশান ঘাটে (বোসের গঙ্গায়) যাই। ঘরে ফিরিতে অনিচ্ছা। মনে হইতেছিল বুঝি ভগবান আবার তাঁহাকে জীবিত করিবেন ও আমরা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী ফিরিব। আমাদের মত লোকের ভাগ্যে তা কি সম্ভব! কাজেই বড় দুঃখে ও কষ্টে ঘরে ফিরিলাম। এ ছাপ্ মুছিয়া ফেলিতে অনেক সময় লাগিয়াছিল। তাঁর কি সুন্দর ও বলিষ্ঠ চেহারা—এখনও মনে হইলে কান্না পায়।

এই সময়ে আমাদের গ্রাম হইতে ইংরাজি স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রদ্ধেয় বাবু উমেশচন্দ্র দত্তের 'ভারত সংস্কারক' (সাপ্তাহিক) ও বামাবোধিনী (মাসিক) পত্র প্রকাশিত হইত। বাংলা স্কুলের বিদ্যা শেষ হইলে ইংরাজি ১৮৭৯ সালে হরিনাভির ইংরাজি স্কুলে ঢুকি। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত এই স্কুলের হেডমাষ্টারী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার সিটি স্কুলে গিয়াছেন। পরে সিটি স্কুল কলেজ হয় ও তিনি তাহার প্রথম প্রিন্সিপাল হন। আমাদের গ্রামে উমেশবাবুর খুব নাম ছিল—নিরহঙ্কারী, পরোপকারী চরিত্রবান্ ও সুশিক্ষক বলিয়া। বাংলা স্কুলে যখন পড়িতাম তখন তাঁহার বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে যাইতাম। রাধানাথ দে বলিয়া একটী ছেলে তাঁহার বাড়ীতে থাকিত ও ইংরাজী স্কুলে পড়িত। তিনি আমায় বড় ভালবাসিতেন। রাধানাথবাবু পরে উকিল হইয়া শিয়ালদহ কোর্টে প্র্যাক্‌টিশ্ করেন। এখন মৃত। তাঁর বড় ভাই T. N. Deb. Engraverর সেকালে খুব নাম ছিল। এখনও তিনি জীবিত। গোলদীঘিতে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দেখিয়াছি।

ইংরাজী স্কুলে তখন ৯টী ক্লাস ছিল। আমি সব নীচের ক্লাসে (9th Class) ভর্ত্তি হইয়া পড়িলাম। First book of Reading (প্যারীচরণ সরকার) ও আখ্যান মঞ্জরী পড়িতে লাগিলাম। ইংরাজী ভিন্ন আর সব বিষয় না পড়িলেই চলিত। কারণ বাংলা স্কুলের বিদ্যাতে অনেক কাজ হইত। এই ক্লাসের বাৎসরিক পরীক্ষায় আমি ক্লাসের মধ্যে প্রথম হই ও 'ডবল' প্রমসন পাইয়া সপ্তম শ্রেণীতে যাই। ইংরাজী স্কুলে আসিয়া অনেক দুষ্টু ছেলে পাই। বাংলা স্কুলে এ আপদ ছিল না। কেহ কেহ চুপি চুপি পণ্ডিতমহাশয়ের টিকি কাটিত বা টানিত আর তিনি ক্রোধে অধীর হইতেন। ঠিক মনে নাই, কি এই রকম কোন ব্যাপারে আমি খুব হাসিয়া ফেলি। পণ্ডিতমশায়ের কোপ দৃষ্টি আমার উপর পড়ে। ফলে এমন একটি চড় দেন যে তাঁর ৫টী আঙ্গুলের ছাপ্ আমার পিঠের উপর রহিয়া যায়। হেডমাষ্টার, বাবু দীননাথ পালিত এই কথা শুনিয়া আমাকে অনেক আদর করেন ও পণ্ডিতমহাশয়কে সাবধান করিয়া দেন। পরে পণ্ডিতমশায়ের আমার উপর সুনজর হইয়াছিল। অনেকে বোঝেন ভালবাসার কি ফল। ভালবাসিয়া দুষ্টকে যেমন 'শিষ্ট' করা যায়, ধমকাইয়া, মারপিট করিয়া তাহাকে তেমন করা যায় না। এ কথা আমি কর্ম্মজীবনে বেশ শিখিয়াছি ও বুঝিয়াছি। আমার নিজের ৫টী ছেলে ও ৪টী মেয়ের গায়ে আমি জীবনে কোনদিন হাত দেই নাই। কিন্তু তাহারা প্রত্যেকেই ভাল। আমাদের গ্রামের ছাত্রেরা স্বর্গীয় গোবিন্দ মাষ্টারমহাশয়ের নিকট পড়া বলিয়া লইত। তিনি কিছু লইতেন না। তাঁহার

হাতের লেখা খুব ভাল ছিল। স্কুলে তিনি আমাদের হস্তলিপির মাষ্টার ছিলেন। কাগজে রুল কাটিয়া বড় বড় A. B. C. D. আমরা লিখিতাম। আমাদের আঁকা বাঁকা লেখা তিনি সোজা করিয়া দিতেন। সপ্তম শ্রেণীতে উঠিলে আমার ইংরাজী পড়া বলিয়া লইবার দরকার হয়। আমি কিন্তু গোবিন্দ মাষ্টার মহাশয়ের কাছে ঐ জন্য যাই নাই। হরিনাভির স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু আমাদের সপ্তম শ্রেণীর মাষ্টার ছিলেন। তিনি আমাকে বড় ভালবাসিতেন। আমি তাঁহার বাড়িতে গিয়া পড়া বলিয়া লইতাম। তাঁহাদের চণ্ডীমণ্ডপে এক বেঞ্চির উপর বসিয়া সকালে পড়াশুনা করিতাম। সপ্তম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষাতে আমি প্রথম হই। আবার 'ডবল' প্রমশন পাইয়া পঞ্চম শ্রেণীতে যাই। এইজন্য অমৃতবাবু আমার উপর খুব সন্তুষ্ট ছিলেন। সপ্তম শ্রেণীতে আমি চিংড়ীপোতার সুরেনকে (বসু) বন্ধুরূপে পাই। সে আজীবন আমার বন্ধু ছিল। তাহার অকাল মৃত্যুতে বড়ই ব্যথিত হইয়াছিলাম। সে ভদ্রতার আদর্শ ছিল। ছাত্র জীবনে সুখে সচ্ছন্দে লালিত পালিত হয়, কিন্তু শেষ জীবনে আর্থিক কষ্টে তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। প্রথম শ্রেণীতে উঠিলেও অমৃত বাবুর নিকট পড়া বলিয়া লইতাম। কখন কিছু তাঁহাকে দিতে হয় নাই বা তিনি কিছু চান নাই। সেকালে শিক্ষকেরা আজকালকার মত mercenary ছিলেন না। এককালে বিদ্যাদান সর্ব্বোচ্চ দান বলিয়া গণ্য হইত। ভারতবর্ষের পণ্ডিতেরা মুক্ত হস্তে মন প্রাণ খুলিয়া তাহা ছাত্রদের দান করিতেন। আজ-কালই আদর্শ বদলাইয়াছে। মাহিনা করা Private Tutorএর

ছড়াছড়ি। বিদ্যাদান ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে। বেচাকেনা সুরু হইয়াছে। অমৃতবাবুর বড় ভাই গোলকবাবু একদিন সপ্তমী অষ্টমী পূজার দিন তাঁহাদের চণ্ডীমণ্ডপে আমাকে পড়িতে দেখিয়া অবাক হইয়া বলেন তুমি নিশ্চয়ই কিছু হইবে। জানি না তাঁহার কথা কতদূর সার্থক হইয়াছে। আমার বেশ মনে আছে গোলক বাবু জগদ্ধাত্রী পূজার রাত্রে গ্রামের লোককে বৎসরের প্রথম ফুলকপি, নূতন আলু ও 'নলেন' গুড়ের সন্দেশ খাওয়াইয়া সুখী হইতেন। খাওয়া দাওয়ার পর সখের দল যাত্রা করিত। সে যাত্রা এখনও আমার মনে জাগিতেছে। রাজা হরিশ্চন্দ্রের অবস্থা পরিবর্ত্তন, প্রতিজ্ঞা পালন ও সহিষ্ণুতা, রাণী শৈব্যার অপত্যস্নেহ ও পতিপ্রেম, ও রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের অনর্থক ক্রোধ কিন্তু তাঁর উদার প্রাণের কি আদর্শই তখন মনের মধ্যে এই অভিনয় জড়াইয়া দিয়াছিল। এ রকম অভিনয় উপভোগ করিবার বিষয় ছিল। হরিনাভির বাবু মহেন্দ্র দে, পূর্ণ ঘোষ ও রামনগরের বাবু বসন্ত সরকার রাজা হরিশ্চন্দ্র, বিশ্বামিত্র ও শৈব্যা সাজিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের অভিনয় খুব ভালই হইত। "বেণী সংহার" প্রণেতা 'নাটুকে' রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় হরিশ্চন্দ্র নাটক লিখিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি হরিনাভি তাঁহার জন্মস্থান এবং তিনিই বাংলা নাটকের জন্মদাতা। কলিকাতার ঠাকুর বাড়ীতে তাঁহার বেণী সংহার নাটকের অভিনয় হইলে, তিনি এক রূপার থালা ও বিস্তর রজত মুদ্রা প্রণামী পাইয়াছিলেন।-

পঞ্চম শ্রেণীতে তখন আমরা Royal Reader no IV,

Fyfe's History of Greece এবং বিদ্যাসাগরের ঋজুপাঠ ১ম ভাগ (সংস্কৃত) পড়িতাম। আমাদের মাষ্টার মহাশয় ভুবন বাবু (ব্রহ্মচারী) History পড়াইতেন। Greeceএর History কেবল মুখস্থ করিতাম। ভিতরে আদৌ প্রবেশ করিতাম না। পরে এই বই কলেজে পড়িয়াছি। বুঝুন কর্ত্তাদের selection, যে ছেলে যত গড়গড় করিয়া বলিয়া যাইতে পারিত, সেই তাঁহার প্রিয় পাত্র হইত। এ বিষয়ে ক্লাশের মধ্যে আমি অগ্রগণ্য ছিলাম। এখন মনে হয়, নির্ব্বোধের মত সে সময়ে স্মৃতি শক্তির কত অপব্যয় করিয়াছি। —পরে যখন স্মৃতি শক্তির সাহায্য বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে তখন আর তেমন পাই নাই। এ কথা ধ্রুব সত্য যে মানুষের বুদ্ধি ও শক্তির বিকাশ হয় উপযুক্ত সময়ে। অসময়ে পাইবার চেষ্টা করা উচিত নয়। তাহার ফল মন্দ বই ভাল হয় না। যেমন আমার কপালে ঘটিয়াছে। আজকাল নীচের ক্লাশে তত মুখস্ত করিতে হয় না। ইহা ভালই বলিতে হইবে। নবীন বাবু (চক্রবর্ত্তী) আমাদের ইংরাজী পড়াইতেন। তাঁর spelling ও grammarএর উপর বেশ নজর ছিল। Fifth classএ আমরা grammar পড়িতাম। ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে অবিনাশকে তিনি ভালবাসিতেন। অবিনাশ গাজীপুরের অভয় ডাক্তারের ছেলে। তাহার সহিত বসিতে খেলিতে ও কথা বলিতে সর্ব্বদাই মন যাইত। সেকালে পঞ্চম শ্রেণীর বৈদিক ব্রাহ্মণ ছেলেদেরও বিবাহ হইত। অবিনাশ যখন ১২।১৩ বছরের, তখন তাহার সমবয়স্কা এক মেয়ের সহিত বিবাহ হয়। এটা কেবল বৈদিক ব্রাহ্মণের ঘরে হইত। তখন প্রথা ছিল,

ছেলে যখন মার পেটে কিম্বা ভূমিষ্ঠ হইয়াছে তখন তার বাবা আর এক মার পেটের কিছুদিনের ছোট এক মেয়ের বাপের কাছে গিয়া সম্বন্ধ স্থির করিত। সে সম্বন্ধে অধিকাংশ স্থলে বিবাহ হইয়া যাইত। বৈদিক ব্রাহ্মণেরা অন্যান্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণের অপেক্ষা দুর্ব্বল ও অল্পায়ু ছিলেন। এই বাল্য বিবাহই তাহার প্রধান কারণ, মনে হয়। আর এত অল্প বয়সে বিবাহ হইলে লেখাপড়ার 'ইতি' শীঘ্রই হইত। কেহ কেহ যে ভাল হন নাই, সে কথা আমি বলি না। তাঁহাদের সংখ্যা খুব কম। এই পঞ্চম শ্রেণীতে আসিয়া সংস্কৃত পাঠের জন্য হেড্‌পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর হাতে পড়ি। তখন হইতে Entrance ক্লাস পর্য্যন্ত তাঁহার হাতেই ছিলাম। তিনি ক্লাসে আসিলে, সকল ছেলেরই আহ্লাদ হইত। তিনি অতি সুন্দর সংস্কৃত পাঠ করিতেন। পাঠের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় রসের সংযোগ হইত। তিনি ক্লাসে আসিলে তাঁহার কথা শুনিয়া আমরা হাসিয়া বাঁচিতাম। হাসি যে মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য আবশ্যক, তাহা সেকালে এবং এখনও অনেক মাষ্টার বা পণ্ডিতরা বোঝেন না। কেবল হাসির জোরে অনেকের উৎকট রোগ সারিয়া যায় শুনিয়াছি। বিলাতে এই চিকিৎসা জারি আছে। এখানে তাহার কোন চিহ্নই দেখিতে পাই না। পঞ্চম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষাতে আমি প্রথম হই ও আবার 'ডবল' প্রমশন পাইয়া তৃতীয় শ্রেণীতে উঠি। এইবার লইয়া তিনবার 'ডবল প্রমশন' হয়। পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত 'ডবল প্রমশনের' দরুণ কোন অসুবিধা কি কষ্ট হয় নাই। থার্ড ক্লাসে আসিয়া, মনে হইল, আমি বোধ হয় পারিব না। এই ক্লাসে

Nelson's senior Reader, P. Ghoshএর Algebra ও Geometry ও Basu's Grammar পড়িতাম। হেডমাষ্টার বাবু দীননাথ পালিত ইংরাজি পড়াইতেন। তিনি Reverend Duffএর ছাত্র ছিলেন। তিনি যখন ইংরাজি পাঠ আবৃত্তি করিতেন, কাণে বড়ই মধুর লাগিত। এ পর্য্যন্ত তাঁহার মত কাহারও ইংরাজি পড়া আর শুনি নাই। পরে মেট্রপলিটান কলেজে P. K. Lahiriর সেক্সপিয়র পড়া কিছু শ্রুতিসুখ দিয়াছিল; কিন্তু দীনবাবুর তুলনায় তাহা কম। যেদিন প্রথম দীননাথ বাবুর মুখে পড়া শুনিয়াছিলাম, সেদিন তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম। তাঁর ভিতর যে অসাধারণ শক্তি ছিল, তাহা সেদিন বুঝিতে পারিয়াছিলাম। দীনবাবুও মনে করিয়াছিলেন যে আমার এবার 'ডবল প্রমশন' ভাল হয় নাই। তাহার মানে আমাকে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হইবে ও তাহার ফলে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে পারে—এই ম্যালেরিয়ার দেশে। কথাটা তিনি ঠিকই অনুমান করিয়াছিলেন। থার্ড ক্লাসে উঠিয়া আমি পড়ার জন্য যত পরিশ্রম করিয়াছিলাম তত আর জীবনে কখন করি নাই। কি কলেজে, কি ডিপুটি পরীক্ষায়। রাত্রি জাগরণে আমার শরীর বড়ই খারাপ হইয়াছিল তার উপর ম্যালেরিয়া আমার ঘাড়ে খুব জোরে চাপিয়া বসিয়াছিল।

ডাক্তার সুরেশ চক্রবর্ত্তী (স্বনামখ্যাত কলিকাতার সার্জ্জন) এই ভয়ে তৃতীয় শ্রেণী হইতে চতুর্থ শ্রেণীতে নামিয়া গেল। সে আসিয়াছিল মজিলপুরের স্কুল হইতে। ভর্ত্তি হয় থার্ড ক্লাসে, কিন্তু কিছুদিন পরে মাষ্টার মহাশয়দের কথা মত চতুর্থ শ্রেণীতে চলিয়া

যায়। আমাকে কেহ নামিয়া যাইতে বলেন নাই। বলিলে ভালই হইত। হয়ত বা তুচ্ছ আত্মসম্মানের খাতিরে নামিতে রাজি হইতাম না। সুরেশ পরে ছাত্র জীবন ও কর্ম্মক্ষেত্রে যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল, তাহা আমরা পারি নাই। তাই সুরেশের আদর্শ লোকের চোখের উপর ধরিতেছি। সুরেশ ঠিক বুঝিয়াছিল। আমি ভুল করিয়াছিলাম। এখন আক্ষেপ হয় কেন সুরেশের মত তখন শক্তির সঞ্চয় করিতে শিখি নাই। অসময়ে প্রচুর পরিমাণে ভাণ্ডার হইতে খরচ করিয়াছিলাম। তাহার ফলে সময়ে ভাণ্ডার শূন্য হয় ও তাহার অনিবার্য্য ফল বরাবরই ভুগিতে হইয়াছে। রাজপুরের মতি (পাশ্চাত্য বৈদিক) থার্ড ক্লাসে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। সে তখনই বেশ ইংরাজি লিখিত। হেডমাষ্টার দীনবাবু তাই মতির লেখার খুব প্রশংসা করিতেন। আমার বেশ কষ্ট হইত যে আমি তেমন লিখিতে পারিতাম না। মতি কখন 'ডবল প্রমশনের' victim হয় নাই। চতুর্থ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় সে প্রথম হইয়াছিল। সব বিষয়ই সে আমার চেয়ে ভাল জানিত, কি ইংরাজি, কি অঙ্ক, কি ইতিহাস, কি সংস্কৃত। ক্লাসে তাহার প্রথম স্থান ভ্রষ্ট করা আমার একমাত্র লক্ষ্য হইল। তৃতীয় শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষাতে আমি প্রথম হইলাম স্বাস্থ্য একেবারে ভঙ্গ করিয়া, মতি দ্বিতীয় হইল। কিন্তু তাহার বিদ্যা ও জ্ঞান আমার চেয়ে ঢের অধিক ছিল। কেবল পরিশ্রমের জোরে আমার ঐ ফল হইয়াছিল। কেন যে এত অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া অকালে শক্তির ক্ষয় করিয়াছিলাম তাহা ভাবিলে এখন নিজের ভুল বেশ

বুঝিতে পারি। মতি ছাত্রজীবনে ও পরে আমার অপেক্ষা অনেক বেশী কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল। কর্ম্ম জীবনে সে শিক্ষকের পদ বরণ করিয়াছিল। অর্থের হিসাবে সে কিছুই করিতে পারে নাই। তবে সে অনেক ছেলেকে হাতে গড়িয়াছে, আর আমি অনেকটিকে জেলে পুরিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ একেবারে ছারখার করিয়াছি।

থার্ড ক্লাসে যখন পড়ি তখন চতুর্থ শ্রেণীর (রাজপুরের) শশীর (চক্রবর্ত্তী) বাংলা লেখা দেখিয়া হিংসা হইত। শশী রাজপুরের বাংলা স্কুলে পড়িয়াছিল। বাংলায় তার বেশ দখল ছিল। আর আমি jack of all trade but master of none. যেমন ইংরাজী তেমন বাংলা, তেমন অঙ্ক, তেমন ইতিহাস, আবার তেমনি সংস্কৃত। সব বিষয়েই সমান সাধারণ জ্ঞান—কোন বিষয়েই পরিপক্কতা হয় নাই। এই ভাবেই সারা ছাত্রজীবন কাটিয়াছে।

এই শ্রেণীতেই আমার এক বন্ধু জোটে। সে সুখে দুঃখে আমার সমভাগী হয়। আজ সে ইহজগতে নাই। তার নাম ছিল বিপিন (সিংহ) পরে সে শ্রীরামপুরে ওকালতিতে বেশ নাম করিয়াছিল। চরিত্রে আমার অনেক উপরে ছিল। অল্পভাষী, পরোপকারী ও হৃদয়বান। পুত্রশোকেই অকালে জীবন ত্যাগ করে। বিপিনের পত্নী এখন স্বামী শোকে জীবন্মৃতা। দু'একবার তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছি ও কাঁদিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি।

শিক্ষার গুণে ছাত্রের মেধা বাড়ে ও তাহার দোষে মেধা কমে এ কথা আমি খুব মানি। অঙ্কে আমি বড় কাঁচা ছিলাম। সেইজন্য মনে মনে বড় ভয় হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ে

বাবু উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (মাইনগরের) অঙ্কের শিক্ষক হইয়া আসেন। তাঁহার অঙ্ক কসাইবার এক স্বতন্ত্র ধারাই ছিল। সেই সুযোগে শুধু যে আমার ভয় কমিয়াছিল তা নয়। সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন অঙ্ক কসিবার আকাঙ্ক্ষাও জন্মিয়াছিল। এক একদিন স্বপ্নও দেখিতাম বুঝি শেষে নিউটন কি টড্‌হনটর হইয়া বসিব! আমাদের গ্রামের বাবু অক্ষয় কুমার মুখোপাধ্যায় (পরে ডাক্তার) ও বাবু জগবন্ধু ঘোষ (পরে Sil's free Collegeএর Head Master) আমাকে খুব ভালবাসিতেন ও তাঁহারা আমার পড়াশুনা বলিয়া দিতেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে যখন উঠিলাম, তখন দীনবাবু আমাদের স্কুল পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার স্থানে বাবু বটকৃষ্ণ মৈত্র এম্, এ হেড্‌মাষ্টার হইয়া আসিলেন। তিনি লম্বা চওড়াতে প্রকৃত ভোজপুরী ছিলেন। জ্বর হইলে এক কড়া সাগু খাইতেন। Simple as a child ও মুখে হাসি লাগিয়াই আছে। তিনি অধিক দিন থাকেন নাই। তাঁহার পরে ধনবল্লভ শেট্ আসেন। তাঁহার সহিত আমার খুব মেশামিশি হইয়াছিল। অনেক দিন এক সঙ্গে খাইতাম, এক ঘরে শুইতাম ও এক সঙ্গে খেলা করিতাম ও বেড়াইতাম। তিনি ফুল বড় ভালবাসিতেন। আমরা এর বাগানের ওর বাগানের ফুল লইয়া আসিয়া তাঁহাকে দিতাম। তাঁহারই যত্নে ইংরাজীতে একটু দখল হইয়াছিল। তাঁহার মধুর ব্যবহারে আমরা সকলে মোহিত হইয়াছিলাম। ধনবল্লভবাবু ইংরাজিতে ইউনিভারসিটির এম, এ পরীক্ষায় প্রথম হন। তিনি ছেলেদের ইংরাজিতে বক্তৃতা দিতে

উৎসাহিত করিতেন। নিজে সুন্দর বলিতে পারিতেন। শনিবারে শনিবারে তাঁহার বক্তৃতা হইত। কিন্তু আমাদের মুখ খোলে নাই। খাইতে, শুইতে, বসিতে, বেড়াইতে ও বাড়িতে মেয়েদের কাছে খুব বক্তৃতা করিতে পারিতাম। সাধারণ স্থলে সকলের সম্মুখে মুখ খুলিতে হইলেই চুপ হইয়া যাইতাম। এখন ভরসা কিছু বাড়িয়াছে কিন্তু স্বভাব যায় নাই। লিখিয়া মধ্যে মধ্যে কোথায়ও কিছু বলিয়াছি কিন্তু তাহাতেও পা কাঁপিয়াছে ও কথা বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। আমি আবার বি,এলও পড়িয়াছিলাম। উকিল হইলে আমার যে কি দুর্দ্দশা হইত তাহা এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি। শিক্ষাতে ছেলেদের একটু free choice দেওযা ভাল। যার যাতে মন যায় তার তাতেই লাগা উচিত। এইটি আমাদের ছেলেদের হয় না। সেইজন্য অনেক স্থলে শিক্ষা কার্য্যকরী হয় না ও অন্নসমস্যার সমাধান হইতেছে না।

বুদ্ধির দোষে খেলা ধূলায় আমার মন বড় যাইত না। ভাল লাগিত দৌড়ঝাঁপ করিতে ও বেড়াইতে। যখন ছোট ছিলাম খুব দৌড়াইতাম। একটু বড় হইলে বেড়াইয়া কাজ সারিতাম। ফুটবল ও টেনিস তখন আসরে নামে নাই। Horizontal barএ ব্যায়াম করা আমার ভাল লাগিত না। দুর্গাপূজা ও মাঘোৎসব আমার ভাল লাগিত। আমার কাকা হারাণচন্দ্র মিত্র ব্রাহ্ম ছিলেন। হরিনাভির মাঘোৎসবে (ফাল্গুন মাসে) কলিকাতা হইতে অনেক বড় বড় লোক আসিতেন। কাকার বাড়ীতেই তাঁহাদের ভোজন হইত। একবার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর একবার, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র

সেন এসেছিলেন। মাঘোৎসবে মণ্ডপ সাজান ও লোকের অভ্যর্থনা করিতে আমার খুব ভাল লাগিত। সে দিন খুব আনন্দে কাটিত। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রায় প্রতি বৎসর আসিতেন। ইঁহারা দু জনেই হরিনাভির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংলগ্ন ছিলেন। দুই জনেই হরিনাভি স্কুলে হেডমাষ্টারি করিয়াছেন। তাঁহারা হরিনাভির বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষীও ছিলেন। নববিধান সমাজের বাবু কেদার নাথ দে (হরিনাভির) আমার কাকার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে থাকিতেন। তাঁহার সন্তান সন্ততি অনেক ছিল। তাহা-দের একজন Dr. Biman Behari De D. Sc (London) এখন Madras Presidency Collegeএর Professor, এক কন্যা, Miss Banalata De B. A. বিহার উড়িষ্যাতে Assistant Inspectress of Schools। তাঁহার এক পুত্র মন্মথধন দে সঙ্গীত বিদ্যাতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সে সময়ে দুর্গাপূজার বিশেষত্ব বেশ হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। মোটামুটি সাধারণ লোকে যাহা করিত তাহা দেখিয়া বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা হইত না। মনে আছে আমাদের গ্রামের স্বর্গীয় বাবু ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভাল ভাল ফল ও মিষ্টি মা দুর্গাকে নিবেদন করিতেন। আনুষ্ঠানিক হিন্দু বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। তাঁহার পুত্রেরা প্রায় সকলেই কৃতী হইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপাল বাবু ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন। মধ্যম শ্রীশবাবু সদর-ওয়ালা হন। আর একপুত্র গিরীশবাবু কলিকাতা ইউনিভার-সিটির রেজিষ্টার হন। সঙ্গীত ও বাজনাতে সকলে সমঝদার ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন ভাল পাখওয়াজী ছিলেন। বোধ

হয় তাঁর নাম সতীশ বাবু। আমাদের দেশে দুর্গাপূজায় শূদ্রেরা ব্রাহ্মণের বাড়ীতে প্রাসাদ পাইতেন। আমি দেখিয়াছি একবার ভুঁড়িদের (ব্রাহ্মণ) বাড়ীতে দুর্গাপূজার সময় ব্রাহ্মণদের পরিত্যক্ত ও উচ্ছিষ্ট পাতে কায়স্থদের খাইতে দেওয়া হয়। কোন কোন ভক্ত অম্লান বদনে সেই পাতে খাইতে আরম্ভ করেন। আবার কেহ কেহ খান নাই। খাওয়া দূরে থাকুক আমি ঘৃণায় ও লজ্জায় সরিয়া পড়ি। মাঘোৎসবে প্রভেদ বিচার ছিল না। সকলেই একসঙ্গে বসিয়া খাইতেন। অবশ্য তাহাতে বড়কে ছোটরা সম্মান করিতে ভুলিত না। আজ কাল অস্পৃশ্য জাতির সমস্যা লইয়া বড়ই আন্দোলন চলিতেছে। পূর্ব্বের অপেক্ষা দেশের আচার ব্যবহার অনেক বদলাইয়াছে। কিন্তু এখনও অনেক বাকি। বুঝি ভগবান সেই জন্যই মহাত্মা গান্ধীজিকে এদেশে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার জীবদ্দশায় সমাজ আরও অগ্রসর হইবে আশা করি।

প্রথম শ্রেণীতে উঠিবার পর ধনবল্লভ বাবু কলিকাতা আলবার্ট কলেজে আসেন। তাঁহার স্থানে স্বর্গীয় বাবু বঙ্কিমচন্দ্র সেন হেডমাষ্টার হন। ইনি খুলনা জেলার সেনহাটির লোক। পরে তিনি ওকালতিতে ফৌজদারিতে বেশ নাম করিয়াছিলেন। ইংরাজিতে বেশ fluent speaker ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ধনবল্লভ বাবুর মত ঘনিষ্ঠভাবে মিশি নাই। তবে তাঁহার কলিকাতার মুসলমানপাড়া লেনের বাসাতে অনেকবার আসিয়াছি ও তিনি আমাদের খুব আদর যত্ন করিতেন। ১৮৮৫ সালের মার্চ্চ কি এপ্রেল মাসে আমাদের Entrance Fxamination হয়। ১৮৮৩ সালের বার্ষিক

পরীক্ষার পর ১৮৮৪ সালের জানুয়ারী মাসে আমরা প্রথম শ্রেনীতে উঠি। পূর্ব্বে ডিসেম্বর মাসে ইউনিভারসিটির পরীক্ষা হইত। ১৮৮৪ সালে কোন পরীক্ষাই হয় নাই। ১৮৮৫ সাল হইতে পরীক্ষার সময় বদলাইয়া যায়। সুতরাং আমরা প্রথম শ্রেণীতে ১৫ মাস ছিলাম। পরীক্ষা হইয়াছিল প্রাতে ৭টা হইতে ১০টা। আমাদের Entrance Examinationএ ৮।৯ দিন লাগিয়াছিল। একে দারুণ গরম তাহাতে পরীক্ষার জন্য রাত্র জাগরণ! ৪দিন পরীক্ষা দিবার পর আমার আবার জ্বর হইল। খুব high temperature, মনে হইল আর পরীক্ষা দিতে পারিব না। রাজপুরের ডাক্তার স্বর্গীয় শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ বি কলিকাতাতে ডাক্তারি করিতেন। তাঁহাকে ডাকা হইল। তিনি সমস্ত শুনিয়া খুব কুইনাইন খাওয়াইয়া জ্বর ছাড়াইলেন। অবস্থা কিন্তু শোচনীয়। আমি হাটিয়া যাইতে অসমর্থ। পাল্কী করিয়া পরীক্ষা গৃহে যাইতে হইল। প্রেসিডেন্সি কলেজের তেতালাতে আমার seat ছিল। সেই ঘরের গার্ড ছিলেন স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল। তাঁহারই যত্নে ও অনুগ্রহে আমি শুইয়া শুইয়া লিখি। কিছুক্ষণ লিখিবার পরই বড়ই দুর্ব্বল বোধ করিতাম ও প্রশ্নের উত্তর জানা সত্ত্বেও না লিখিয়া চলিয়া আসিতে হইত। এই ভাবে ৪।৫দিন কাটিবার পর পরীক্ষা শেষ হয়। শিক্ষকদের ও আমার আশা ছিল প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইব কিন্তু তাহা হয় নাই। দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হই। মতি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয় ও দশ টাকা Scholarship পাইয়াছিল। আমাদের স্কুল হইতে সেবার ৫জন উত্তীর্ণ হয়। মতি (রাজপুর),

অখিল (রাজপুর), রাজেন (চিংড়ীপোতা), সারদা (জগদ্দল) ও আমি (হরিনাভি)। অখিল, সারদা ও আমি তিনজনেই দ্বিতীয় বিভাগে। রাজেন তৃতীয় বিভাগে।

মতি ও আমি সিটি কলেজে ঢুকি। আমার কাকাবাবু হারাণ চন্দ্র মিত্র কলেজের প্রিন্সিপাল উমেশ বাবুর প্রিয়পাত্র ছিলেন। আমরা দুজনেই কলেজে free student হই। মতি উপরন্তু কলেজের কর্ত্তৃপক্ষদের কাছ থেকে কিছু জলপানি আদায় করিয়াছিল। তখন এই কলেজের খুব নাম হয় নাই। পল্লীমাতা ও জননীর কোল ছাড়িয়া ১৬।১৭ বৎসর বয়সে কলিকাতায় আসি। প্রথম প্রথম মন একেবারেই সহরে বসিত না। গ্রামের মাঠ ঘাট, জল হাওয়া, লোক জন, স্কুল, যেন বড়ই ভাল ছিল। সহরে আসিয়া যেন প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

সিটি কলেজ তখন মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে। গোল দীঘির দক্ষিণে। বাসা হইল ব্রজনাথ মিত্রের গলিতে। একতালা বাড়ী। বারবাড়ীতে বেশ জায়গা ছিল। জল ও পাইখানার কোন কষ্ট ছিল না। আমার পিতার কাকা সারদাবাবু এই বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন। তিনি সপরিবারে সেখানে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র হেমনাথ আমাদের সঙ্গে ১৮৮৫ সালে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দেয় কিন্তু পাস করিতে পারে নাই। আমরা দু'জনে বাহির বাড়ীতে থাকিতাম ও লেখাপড়া করিতাম। মাসে ২।৩ বার করিয়া বাড়ী যাইতাম। বাড়ী যাবার দিন কি উৎসাহ! বাড়ী পৌঁছিলে, মা প্রথমে চেহারার দিকে নজর করিতেন। খাওয়া দাওয়ার কত

কথাই জিজ্ঞাসা করিতেন। যে, সব জিনিষ খাইতে ভালবাসি ও কলিকাতায় খাইতে পাইতাম না—তাহার সমস্ত যোগাড় হইত। যখন কলিকাতায় ফিরিতাম মার চক্ষু ছলছল করিত। মায়ের কাছে ছেলে যে কি আদরের তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতাম। বলিতে লজ্জা ও দুঃখ হয়, ছেলের কাছে মাদের এখন আর তত কদর নাই।

সিটি কলেজের গঠন প্রণালীতে প্রাণের মধ্যে কোন দিন কোন সাড়া পাই নাই। ইংরাজি পড়াইতেন মিঃ এম্, এল, গুপ্ত। তিনি স্বনামধন্য বি, এল্ গুপ্তর কনিষ্ঠ। ইতিহাস পড়াইতেন বাবু কালীশঙ্কর শুকুল। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লোক। কিন্তু কলিকাতায় তাঁহার বাসভূমি হইয়াছিল। অঙ্ক কসাইতেন বাবু যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। পরে তাঁহার Arithmeticএর খুব নাম হয়। সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন পণ্ডিত বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন। পদার্থবিদ্যা পড়াইতেন বাবু রাজেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি। শিক্ষক ও মানুষ হিসাবে শুকুল ও রাজেন্দ্রবাবু ভালই ছিলেন। আমাদের সঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে পড়িতেন ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী, সুবোধ মহলানবিশ, নীলমণি মুখোপাধ্যায়। সুবোধের মত রসিক ক্লাসে আর কোন ছেলেই ছিল না। সে খুব হাসাইতে ও নকল করিতে পারিত। সে রাজেন্দ্রবাবুর বেশ প্রিয় পাত্র ছিল। বিজ্ঞানে তার একটা আন্তরিক টান ছিল। এই সুবোধই আজকালের S. C. Mahalanabis প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন দিগ্‌গজ প্রফেসর। কলেজ ছাড়িয়া আর আমাদের সাক্ষাৎ হয় নাই। ইন্দুভূষণ পূর্ণিয়ার একজন খ্যাতনামা

উকিল। পূর্ণিয়াতে তাহার সহিত অনেকবার দেখা হইয়াছে। নীলমণি এখন আলিপুরে প্রথম শ্রেণীর সিনিয়র উকিল। মধ্যে মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হয়। বড় ধীর স্থির লোক। হাকিমি চাকরি হয় নাই বলিয়া কত আক্ষেপই এক সময় করিত। এখন কিন্তু মফঃস্বলের হাকিমদের অনেক উপরে তাহার স্থান। যতদূর স্মরণ হয় কলেজের অধ্যাপকরা অল্পই খোঁজ লইতেন ছেলেরা কেমন তালিম হইতেছে। দুই বৎসরের মধ্যে কোন পরীক্ষা লওয়া হয় নাই। কেহ কেহ বলিতেন কলেজের ছেলেরা ত স্কুলের ছাত্র নয়। তাহাদের আবার পরীক্ষা কেন? সব কলেজে অবশ্য এ নীতি জারি ছিল না। এই সব কারণে কলেজের পড়াশুনাতে আমার খুব উপকার হয় নাই। নিজের চেষ্টাও কমিয়াছিল কারণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পরীক্ষা ছিল না। যতদূর মনে হয় সংস্কৃত ও ইংরাজি অধ্যাপকের নিকট না পড়িলেও চলিত। যে সকল text book ছিল, তাহার হরেক রকম নোট বাহির হইয়াছিল। সেই সব নোট পড়িয়াই পরীক্ষা সহজেই পাস করা যাইত। ইংরাজি ও সংস্কৃত শ্রুতিমধুর করিয়া একদিনও কোন অধ্যাপক পড়ান নাই। ভাষার যে প্রাণ আছে তাহাও বুঝিতে দেন নাই। আমরা যখন এফ, এ, ক্লাসে পড়ি তখন সিটি কলেজের বি, এ, ক্লাসে বাবু জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য পড়িতেন। ইনি ইউনিভারসিটির একজন বিখ্যাত ছাত্র। তাঁহাকে সামলানই কলেজের প্রফেসরদিগের পক্ষে মুস্কিল ছিল। যখন প্রফেসরেরা জানকীবাবুর ক্লাসে যাইতেন তখন যেন প্রফেসরে ও ছাত্রে মল্লযুদ্ধ হইত। যদি জানকীবাবুর হাত হইতে প্রফেসর

ভালয় ভালয় অব্যাহতি পাইতেন তবেই তাঁহার রক্ষা নতুবা পরে গোলে পড়িতেন। জানকীবাবুর ক্লাসে ও প্রফেসরদিগের নিকট খুব প্রতিপত্তি ছিল। মধ্যে মধ্যে তাঁহার ও প্রফেসরের মধ্যে এত তর্কযুদ্ধ হইত যে আমাদের ভয় হইত বুঝি মারপিট সুরু হইয়াছে। ছুটিয়া দেখিতে যাইতাম কেবলই দুজনের মুখ চলিতেছে কাহারও হাত চলে নাই।

কলিকাতার বাসা উঠিয়া যাওয়াতে কয়েক মাস বাড়ী হইতে রেলে কলেজ যাতায়াত করিতে হইয়াছিল। সকাল ৮টার সময় প্রস্তুত হইতাম ও বৈকাল ৬ টার সময় বাড়ী ফিরিতাম। পড়াশুনা বিশেষ করিতাম না। করিবার সামর্থ্যও থাকিত না। যাওয়া আসাতেই অধিক সময় কাটিয়া যাইত। পথ চলারও মেহন্নৎ কম হইত না। দ্বিতীয় বৎসর যখন কলেজে পড়ি তখন আমার দাদার বিবাহ হয়। দাদা আমার চেয়ে তিন বৎসরের বড়। বিদ্যা ইংরাজি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণী। যখন বিবাহ হয়, তাঁহার পেশা চাকরীর উমেদারী। সমাজে তখন এই ছেলেরই কত দর! মজিলপুরে বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঘোষের কন্যাকে দাদা বিবাহ করেন। বিবাহে বরকর্ত্তা প্রকৃতপক্ষে আমিই ছিলাম। বয়স তখন আমার ১৮।১৯। দাদার বিয়ে দিয়ে বৌদিদিকে বাড়ী আনিলাম। বৌদিদি খুব সুন্দরী ছিলেন ও কথায় বার্ত্তায় একেবারে ভট্টাচার্জ্জি পণ্ডিত। মা ত বউ পাইয়া বড় খুসি। দাদার কুল করিতে হইয়াছিল। তথাপি দাদার শ্বশুর বিবাহের খরচের জন্য ২০০।৩০০ টাকা নগদ দিয়াছিলেন।

স্মৃতি কণা

১৮৮৭ সালের এপ্রেল কি মে মাসে আমাদের এফ্-এ পরীক্ষা হয়। পরীক্ষার ২।৩ মাস আগেই কলেজের পড়া-শুনা বন্ধ হইয়াছিল। ঐ ২।৩ মাস বাড়ী বসিয়া যে পরিশ্রম করিয়াছিলাম তাহারই ফলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। পরীক্ষা স্থুরু হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে আমার একটি Carbuncle হয়। ভয় হইয়াছিল বুঝি পরীক্ষা দিতে না পাই। কিন্তু আমাদের দেশের ডাক্তার বাবু শ্রীশচন্দ্র রায়ের যত্নে ও ভূতনাথ কাকার শুশ্রূষায় শীঘ্র সারিয়া উঠি। পরীক্ষা সকালেই হয়। ৬ টা হইতে ১০ টা।

এফ্-এ পাশ করিয়া তিন বৎসরে অর্থাৎ ১৮৯০ সালে বি-এ পাশ করি, কারণ এক বৎসর ডিগ্‌বাজি খাই। পরে বি-এল পড়ি। বি-এল পড়িতে পড়িতে ডেপুটি পরীক্ষা দেই—১৮৯২ সালে ডেপুটি হই। তার পর ৩৩ বৎসর অর্থাৎ ১৯২৫ ইংরেজীর ডিসেম্বর পর্য্যন্ত চাকরি করি। তার কাহিনী মস্ত। বলিতে গেলে একখানি পৃথক বই লিখিতে হয়। তাহা পরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল। এখন এই পর্য্যন্ত।

সিংহের নবদ্বীপ দর্শন

এ সিংহ পশুরাজ নন। ইনি পুরুষসিংহ, ডাক্তার হীরালাল, বাংলা গভর্ণমেণ্টের কেমিক্যাল একজামিনার। তিনি একদিন আমাকে বলিলেন, নবদ্বীপ যাবেন? বয়স এখন আমার ৫৯। ভাগ্য দোষে এপর্য্যন্ত বাংলার বৃন্দাবন এই শ্রেষ্ঠ পুণ্যতীর্থ দর্শন ঘটে নাই। ৪৪০ বৎসর পূর্ব্বে, বাংলার কানে গৌরাঙ্গদেব যে সুর বাজাইয়া ছিলেন, তাহা এখনও অনেকের কানে বাজিতেছে। এ কথা ঠিক যে, সে সুর কানের ভিতর দিয়া বাংলার মর্ম্মস্থলে পৌঁছিয়াছিল। তবে সুরের আর তেমন জোর নাই, নরম হইয়াছে। যে স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ কীর্ত্তনে সকল নরনারীকে মাতাইয়াছিলেন, যে স্থানে তিনি একাধারে লক্ষ লক্ষ নর নারীর সঞ্চিত প্রেম বুকে ধরিয়া উচ্চ নীচ সকলকে সমভাবে বিলাইয়াছিলেন; সে স্থানের মাহাত্ম্য, আমি আর কি বর্ণণা করিব? এমন স্থান চক্ষুতে দেখিবার ও তাহার তথ্য সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা কাহার না হয়। শান্ত নদীতেও বাণ ডাকে, স্তব্ধ প্রাণেও জোয়ার আসে। বলা বাহুল্য, এই সুযোগ ছাড়ি নাই। পুরুষসিংহকে ধন্যবাদ, যে এমন কাজে তিনি আমার সহায় হইলেন।

আমরা দুই বন্ধু কলিকাতা হইতে সকাল ৬ টার সময় নবদ্বীপের পথে বাহির হইলাম। হাওড়া ষ্টেশনে ৬৷৷০ টায় পৌঁছিলাম, ৭ টার ট্রেন ধরিলাম। যে লাইন দিয়া এই ট্রেন যায়, তাহার নাম ব্যাণ্ডেল-বড়হারোয়া। বাঁশবেড়ে ও কালনার নিকট হইয়া যাইতে

হয়। বেলা ১১ টার সময় নবদ্বীপ ষ্টেশনে ট্রেন পৌছিল। কালনা কোর্ট ষ্টেশন হইতেই ভাগ্য একটু সুপ্রসন্ন বোধ হইল। ২।৪ জন বৈষ্ণব ভিক্ষুক কীর্ত্তন করিতে করিতে আমাদের গাড়ীতে উঠিল, মনে হইল নবদ্বীপের কাছে আসিতেছি না হইলে এমন হইবে কেন? ট্রেনে বসিয়া বৈষ্ণব ভিক্ষুকের কীর্ত্তন আর পূর্ব্বে কখন শুনি নাই। কীর্ত্তনও যেমন তেমন নয়, বড়লোকের পাতে দিবার মতন।

হাওড়া হইতে নবদ্বীপ ই, আই, রেলে ৬৬ মাইল। মধ্যে কোন নদ নদী পার নাই। আর এক পথ আছে, কৃষ্ণনগর হইয়া। সে পথে সময় ও ভাড়া বেশী লাগে। থার্ড ক্লাসের ভাড়া হাওড়া হইতে নবদ্বীপ ১৷৶১০। আমরা তীর্থ যাত্রী। স্বল্প ব্যয়ে চলিতে চাই। তাই থার্ড ক্লাসে গিয়াছিলাম। বিশেষ কোন কষ্ট হয় নাই।

ষ্টেশনে নামিয়া, এক ঘোড়ার গাড়ী করিয়া গঙ্গাতীরে গেলাম। গঙ্গা এখানে ভাগীরথী নামে প্রসিদ্ধা। ভাগীরথী ও জলঙ্গীর এখানে সঙ্গম হইয়াছে। মার চেহারা জীর্ণা, শীর্ণা ও মলিনা। স্রোত নাই বলিলেই হয়। মনে হইল, মা যেন কাঁদিতেছেন। এমন কেন হইল তা ভাবিতে আমার কিছু সময় গেল। P.W.D.র পণ্ডিতেরা বলিবেন যে মার বুকে চড়া পড়িয়াছে। আমি কিন্তু বলিব, এই পুণ্য তীর্থে একদিন যে প্রেমের ঢেউ উঠিয়াছিল, তাহাতে এখন ভাটা পড়িয়াছে। আবার কবে সেই শুভদিন আসিবে সেই ভাবনায় মায়ের প্রাণ আকুল। তাই তাঁর বুকে শেল বিঁধিয়াছে। কলিকাতা হইতে কলের জলে স্নান করিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু মার স্বচ্ছপূত সলিল দেখিয়া আবার স্নান করিবার ইচ্ছা হইল। চারি

দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া মার অবস্থা দর্শন করিবার জন্য একখানি নৌকা ভাড়া করিয়াছিলাম। গঙ্গাতীরে অনেক বৈষ্ণব নরনারী দেখিলাম; স্নান শেষ করিয়া পদব্রজে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলাম। প্রথমেই গৌরাঙ্গের বাড়ী গেলাম। ফটক পার হইয়া নাট মন্দির। তাহার সামনে মন্দিরে প্রভুর মূর্ত্তি। কি অপরূপ রূপ! এমন রূপ আর দেখি নাই। এ রূপ নিম্বকাষ্ঠের। এই মন্দিরের সেবাইৎ পণ্ডিত আশুতোষ গোস্বামী ও তাঁহার পুত্র পণ্ডিত নবগোপাল বেদান্ত ভাগবতরত্নের সহিত সাক্ষাৎ ও মঠের তত্ত্বাবধান সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইল। তাঁহাদের মুখে শুনিলাম প্রভুর যে মূর্ত্তি মন্দিরে আছে, তাহা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রিয়াজী প্রভুকে কিছুতেই ছাড়িতে চান না। প্রভুও থাকিতে অসমর্থ। এই অবস্থাতে প্রভু প্রিয়াজীকে এই প্রতিমূর্ত্তি দিয়া বিদায় লইলেন ও বলিয়া গেলেন যে তাঁহার বিরহ বেদনা আর থাকিবে না। এ ঘটনা সত্য কি মিথ্যা জানি না। আমাদের এই বাংলা দেশের স্ত্রীলোকেরা প্রতিমূর্ত্তি পূজা ও সেবা বহুদিন হইতেই করিয়া আসিতেছেন। এইরূপ পূজা ও সেবা করিতে করিতে মূর্ত্তি ও প্রতিমূর্ত্তির পার্থক্য থাকে না। প্রতিমূর্ত্তিই সজীব মূর্ত্তি হন, নকল তখন আসলের কাজ করে। এ ভক্তির কথা প্রেমের কথা। যাঁহাদের তেমন ভক্তি, তেমন প্রেম নাই, তাঁহারাই এসব কথা বুঝিতে পারেন না। মন্দিরে ।/০ করিয়া আমাদের দুইজনকে ॥/০ দর্শনী দিতে হইল। সাধারণ লোকের পক্ষে এত পয়সা দিয়া দর্শন, কষ্টসাধ্য। এ বিষয়ে সেবাইৎ মহাশয়েরা বিবেচনা করিলে ভাল হয়।

পলাপে

মফঃস্বল পুলিশের মনস্তত্ত্ব

ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের ছুটীতে কলিকাতায় ছিলাম। একদিন সকালে বিছানা হইতে উঠিয়া দেখি, বাড়ী আমার পুলিশে ঘেরাও করিয়াছে। ইনস্পেক্টার, সবইনেস্পেক্টার, হাবিল্দার ও কনষ্টেবলে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ। একটু পরেই মিষ্টার মিত্র কে ও কোথায় থাকেন খোঁজ পড়িল। আমি বলিলাম আমিই ত মিষ্টার মিত্র এবং সশরীরে হাজির আছি। তখন ইনস্পেক্টার সাহেব আমার হাতে একখানি লিফাফা দিলেন। লিফাফা হাতে লইয়াই মনে হইল, হয় খানাতল্লাসের পরোয়ানা—নয় গ্রেপ্তারের ওয়ারেণ্ট। পড়িবার আগেই লিফাফা হাত হইতে পড়িয়া গেল, সম্ভবতঃ ভয়েই। ইনস্পেক্টার সাহেব লিফাফা উঠাইয়া লইয়া বলিলেন "হুজুর, আপ্‌কা দামাদ্‌কা চিঠি হায়।" আমি বলিলাম "কিস্ উয়াস্তে।" একটু ভরসা হইল। কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম অনুরোধপত্র। জামাই বাবাজী লিখিয়াছেন ইঁহাদের কলিকাতায় থাকিবার সুবিধাজনক স্থান নাই, তাই আমার বাড়ীতে স্থান দিতে। হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। কি বিপদই প্রথমে মনে হইয়াছিল।

চাকরীর অধিকাংশ সময় ত আমিই পুলিশের অতিথি হইয়াছি। হয় থানায়, নয় তাহাদের এলাকায়। পূর্ব্বে পুলিশের লোক কখনও আমার অতিথি হয় নাই। তাই ব্যাপারটা একটু নূতন বোধ হইল।

'জোব্বা জাব্বা' ছাড়িয়া সকলেই (৭।৮ মূর্ত্তি) এক সঙ্গে পাইখানা যাইতে চাহিল। আমার ত সম্বল সবে মাত্র একটি।

তাও ভাড়া খাটিতেছে। ৭।৮টা পাইখানা কি করিয়া জোগাড় করি ভাবনা হইল। অনেক অনুসন্ধানের পর ২টীর জোগাড় হইল। একটিতে ৪ জন ও আর একটিতে ৪ জনকে পালাপালি করিয়া যাইতে বলিলাম। তাহাতেই তাহারা খুব খুসি। পাইখানা ও স্নান শেষ করিয়া সকলে কাপড় চোপড় পরিয়া কালীঘাটে যাইবার জন্য প্রস্তুত। কি গাড়ীতে যাইবে এই লইয়া নিজেদের মধ্যে বাদানুবাদ হইল। কেউ বলেন বাস, কেউ বলেন ট্রাম, কেউ বলেন টাক্সি, কেউ বলেন ঠিকাগাড়ী—উদ্দেশ্য অবশ্য যেটা সস্তা সেটাই চড়া।

চা পান ও জলযোগ সারিয়া সকলে বহির্গত হইলেন। আমাকে সঙ্গে যাইতে হইল, গাড়ীতে তুলিবার জন্য। গাড়ীতে চড়িবার আগে সকলের কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট দেখিবার ইচ্ছা হইল। আমি সঙ্গে রহিলাম। যা নজরে পড়িতেছে তাহাই কিনিতে ইচ্ছা, কিন্তু কোনটিই দামে পটিল না। দোকানদার যে দাম বলে, তার কম তারা দিতে চায়। শেষে দোকানদার ও পুলিশের লোকেদের মধ্যে মারামারি হইবার উপক্রম। আমি ত অস্থির হইয়া বলিলাম কলিকাতায় জিনিষের দাম বড় বেশী, এখানে কেনা সুবিধা হইবে না। একজন দারোগা বলিলেন, আর কিছু হউক না হউক তাঁহার এক গাছা পুষ্পহার চাই, হীরা বসান। লইয়া গেলাম ঠাকুরদাস জহরলালের দোকানে। পুষ্পহারে দাম চাহিল, ৯০০৲ টাকা। দাম শুনিয়া দারোগার আক্কেল গুড়ুম! কি বলিবে কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া, দাম কমাইতে বলিল। দোকানদার বলিল,

এক কড়ি কম হইবে না। তখন আর কোন উপায় নাই দেখিয়া দোকান হইতে বাহির হইলাম। পুষ্পহারের সখ তখন মিটিয়াছে। পরে তাহার মুক্তার হার কিনিতে ইচ্ছা হইল। সেও সুবিধা হইল না। অবশেষে কিছু ছোট ছোট মুক্তা কিনিয়াই ক্ষান্ত হইলেন।

অনেক কষ্টে সাতজনকে ট্রামে চড়াইলাম। কলেজ ষ্ট্রীট হইতে কালীঘাট যাইতে ট্রামের ভাড়া চাহিল ৵১০ করিয়া। তাহাতে কেহ খুসি নয়। যখন টিকিট দিতে আসিল, তখন কনডক্‌টরকে একজন বলিলেন, টিকিটের দাম ৵১০ হইতে ৵০ করিতে। এই শুনিয়া ত ট্রামশুদ্ধ লোক হাসিয়া উঠিল। আমি কিন্তু ইহাতে হাসিলাম না। ২০।৩০ বৎসর বেহারে ও ছোট নাগপুরে কাটাইয়াছি। সেখানে পুলিশের চাল চলন দেখিয়াছি,—সাধারণ লোকে যে দামে জিনিস পায়, তাহার অপেক্ষা সস্তা দামে পুলিশেরা পাইয়া থাকে। যারা বেচে তারা ইচ্ছাপূর্ব্বক বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেয়। ও সব দেশে পুলিশের ধারণা, দোকানদার যে দাম চাহিবে, আসল দাম তাহার অনেক কম। সুতরাং ট্রামওয়ে কনডক্‌টরকে টিকিটের দাম কমাইতে বলা বেহার ও ছোট নাগপুর অঞ্চলের পুলিশের পক্ষে কিছুই বিস্ময়কর নহে। তবে কলিকাতায় বেচারীদের যে দোকান-দারেরা আদৌ আদর করিল না এই আমার বড় দুঃখ! ইঁহারা আসিয়াছিলেন হাজারীবাগ জিলার জঙ্গল হইতে।

শেষে আমি হলফ করিয়া বলিতে পারি যে ইহার এক অক্ষরও মিথ্যা নয়। ইহা একটী বিরাট সত্য। তা না হইলে এত কাগজ, কালি ও কলমের শ্রাদ্ধ করিতাম না।

দাম্পত্য-জীবনের ছবি

৪২।৪৩ বৎসর আগে, যখন এফ-এ পাশ করি তখন বে'র সম্বন্ধ একটু আধটু সুরু হইল। পাড়ার ব্রাহ্মণেরা প্রথমে দু' একটী সম্বন্ধ লইয়া আসিলেন। বে' হবে আমার। আশ্চর্য্য এই যে আমার সঙ্গে তাঁহারা একটি কথাও বলেন না। চুপি চুপি অন্দরে ঢুকিয়া, দাদা ও মার সঙ্গে কথা কন ও প্রস্থান করেন। আমি যেন কাণ পাতিয়া শুনি না, কিছুই বুঝি না ও জানি না, এই ভাবেই চলি। যে কারণেই হউক এই সব ব্রাহ্মণদের উপর আমার ভক্তি ও ভালবাসা গাঢ় হইতে লাগিল। যখন দেখি তাঁহারা আমাদের বাড়ী যাচ্ছেন; তখন মুখে হাসি ও মনে খুসীর উদয় হইত। নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করি, 'বাবা ঠাকুর, যাইতেছেন কোথায় ? উত্তর পাই তোমাদের বাড়ী! লজ্জার মাথা খাইয়া 'কেন' আর জিজ্ঞাসা করিতে পারি না। এই ভাবে ত কিছু দিন গেল। ফল কিন্তু 'নাদারদ্'।

আমাদের পোড়া বাংলা দেশের জল হাওয়ার গুণেই হউক আর শিক্ষার দোষেই হউক ছেলে মেয়েরা অল্প বয়সে বে'র কথা ভাবে ও কিছু কিছু বোঝে। বয়স তখন আমার ১৮।১৯ তাই বসন্তের দখিণা হাওয়ায়, চাঁদের আলোয়, ফুলের সুগন্ধে ও কোকিলের ডাকে মন চঞ্চল হইল। কিঁ যেন চাই, কিন্তু পাই না, এই ভাব। রবীন্দ্রনাথের তখন এত নাম হয় নি। তবুও তাঁর হাওয়ার মত হাল্কা কবিতা পড়ি ও সেই সঙ্গে

উড়ি। এত করেও ভাগ্য কিন্তু সুপ্রসন্ন হয় না! এই বড় আন্তরিক দুঃখ!

১৮৮৭ সালের শ্রাবণ মাসে যখন কলিকাতায় Third year বি-এ ক্লাসে পড়ি, হঠাৎ এক দিন আমার বে'র সম্বন্ধ পাকা হইয়া গেল। একটা হেস্ত নেস্ত হইল ভাবিয়া একটি ছোট্ট স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম। দু' এক দিন পরে মন আবার অস্থির হইল। এ কালের মত বে'র আগে কনে দেখিতে পাই নাই। কনের রূপ ও গুণ সম্বন্ধে কেবল গল্পই শুনিতে লাগিলাম, প্রাণ তাহাতে ঠাণ্ডা হইল না। কেউ বলে কালো, কেউ বলে শ্যাম, কেউ বলে উজ্জ্বল শ্যাম। গৌর কিন্তু কেউ বলে না। আবার কেউ বলে মোটা। কেউ বলে কনে একেবারে না।

কথা গুলোর কি মানে হইতে পারে তাহাই দিবানিশি ভাবি। কোনও কূল কিনারা না পাইয়া শেষে ঠিক করিলাম বে'র সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাই ভাল। নিজে দেখিলে সব গোল মিটিয়া যাইবে। শেষে একদিন শ্রাবণের মুষলধারার মধ্যে বর-বেশে হাজির হইয়া পত্নী-রত্ন লাভ করিলাম। মনে ভাবিয়াছিলাম, রত্ন দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিব। লজ্জায় কনের মুখের দিকে চাহিতে পারিলাম না। বোকা ছেলের মত, সেই চেলির কাপড়ে জড়ান বস্তুটিকে না দেখিয়াই না বুঝিয়াই মন প্রাণ অর্পণ করিয়া বসিলাম। মনে হইল কতই সুন্দর একটি মেয়ে না জানি ঐ চেলির কাপড়ে জড়ান আছে। আশা ছিল, বাসর ঘরে সব ঠিক হইবে; কিন্তু বে'র রাত্রে এত রূপসীরা জড় হইয়াছিলেন

ও আমাদের দু'জনকে এতই বেকুব বানাইয়া ছিলেন যে আমরা পরস্পরকে চক্ষু মেলিয়া দেখিবার অবসরই পাই নাই।

যাক্ অনেক কষ্টে রত্ন ত লাভ করা হইল, কিন্তু ভোগ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল, তাহা পরে বিবৃতি করিতেছি।

বিবাহের কিছুদিন পরেই শ্বশুর বাড়ী হইতে কলেজে প্রথম ডাক আসিল। এ ডাক আমাদের বাড়ীর ভিতর দিয়া আসে নাই। উপরে উপরে একেবারে আমার কাছে। সুতরাং Informal. Formal কি Informal বিচার করিবার মত মনের অবস্থা তখন ছিল না; কারণ আমি এই রকম একটা ডাকের অপেক্ষায় অনেক দিন হইতে বসিয়া আছি। কলেজের ছুটির পর বৈকালে শ্বশুর মন্দিরে গিয়া উপস্থিত। এই আধ মাইল পথ একখানি Second Class ঘোড়ার গাড়ীতে যাইতে হইল। এর চেয়ে ঢের বেশী পথ রোজই হাঁটি। কিন্তু বাংলার Social Codeএ লেখা আছে যে শ্বশুরের পয়সায় গাড়ী ভাড়া করিয়া প্রথম প্রথম শ্বশুর বাড়ী যাইতে হয়। এ সনাতন রীতি ব্যতিক্রম করা কার সাধ্য?

শ্বশুর মহাশয় ও শ্বশুর বাড়ীর মেয়েরা খুব আদর যত্ন করিয়া আমাকে খাওয়াইলেন ও ছাই ভস্ম কত কি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। যার উদ্দেশে আসা ও খাওয়া, তার কায়া কি ছায়া পর্য্যন্ত নজরে পড়িল না। ভাবিলাম সবুরে যদি মেওয়া ফলে। খাওয়া দাওয়ার পরে বাহিরে গিয়া বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে একথা সেকথার পর, শ্বশুর মহাশয়

বেশ ভাল মানুষের মত অম্লানবদনে বলিলেন তুমি ত বাড়ীতে বলিয়া আস নাই। তাঁহারা ভাবিবেন। সুতরাং সন্ধ্যার ট্রেনে বাড়ী যাওয়া দরকার। আমি তখন প্রত্যহ বাড়ী হইতে কলিকাতা যাতায়াত করি। অকস্মাৎ যে এমন ঝড় উঠিবে, তাহা ভাবি নাই। মাথা ঘুরিয়া গেল। কোন প্রাণে, প্রিয়াকে একবার না দেখিয়া বিদায় লইব, এই ভাবনায় আকুল হইলাম। কনের বয়স তখন ১০।১১। আমার উষ্ণ মস্তিস্কে ঢু দিল, সে না জানি আমার বিরহে কতই কষ্টে আছে! সে যাহা হউক, অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে ঐদিন সন্ধ্যার গাড়ীতে বাড়ী আসিতে হইল। কনের সঙ্গে আর দেখা হইল না কারণ শ্বশুর বাড়ীতে জোর করিয়া থাকা চলে না। হৃদয় ব্যথায় ভরিয়া গেল! সেকালে আমার শ্বশুরের খ্যাতি ছিল একজন বড় Disciplinirian বলিয়া। বিবাহ হইলেই সঙ্গে সঙ্গে সহবাস আবশ্যক, এ কথা তিনি নানা কারণে মানিতেন না। সুতরাং বিবাহের পরে অনেক বছর আমাকে শিক্ষানবিশীতে থাকিতে হইয়াছিল। এই কড়াকড়ির জোরে আসলে গোল বাধিল। Third yearটা ত কনেকে ভাবিতে ভাবিতে কাটিল। দেখা-সাক্ষাৎ নাই বলিলেই হয়। Fourth yearর অর্দ্ধেক তদ্রূপ। যখন বি-এ পরীক্ষা নিকট হইল, তখন পড়িবার একটু চাড় হইল। এই সময়ে একবার কনে আমার সঙ্গে কালি কলমের Exercise জুড়িয়া দিলেন। লেখে সামান্য ও সহজ কথা। কিন্তু আমি ভাবি কতই ব্যথা ও অশ্রু-কণা ঐ কথার পিছনে লুক্কায়িত। এই সব ঘোর বাধা সত্ত্বেও পরীক্ষা দিতে বসিলাম। কিন্তু পাস করিতে

পারিলাম না। শ্বশুর মহাশয় রাস তখন আরও কড়া করিলেন। মানুষের একটু লজ্জা ত আছে। আমারও একটু হইল, কারণ ফেল হওয়াটা বে'র পূর্ব্বে আর ঘটে নাই। কোনরূপে পুনরায় এক বৎসর কাটাইয়া পাস করিয়া ফেলিলাম। তখন আবার একটু সুবিধা হইল। কিন্তু যতদিন না চাকরীর পরীক্ষা দিয়া ডেপুটি হই, ততদিন বেশ একটু কড়াকড়ির ভিতর থাকিতে হইয়াছিল।

১৮৮৭ সালে বিবাহ হয়। ১৮৯২ সালে চাকরীতে ঢুকি। এই দীর্ঘ ৫ বৎসর শিক্ষানবিশীতে কাটিয়াছিল। রোম্যান্স তার জন্য আদৌ কমে নাই বরং বাড়িয়াই যাইতেছিল।

কথায় আছে, Pleasure lies in the chase, not in the game, আমিও সেই পথের পথিক হইয়াছিলাম। মনে হয় একদিন সন্ধ্যার সময় শ্বশুর বাড়ীতে যাই। খাওয়া দাওয়ার পর শুইতে গিয়া দেখি, কনে অনেক আগেই বিছানা দখল করিয়াছেন। সেবারের মত কনের অপেক্ষায় অনেকক্ষণ কাটাইতে হইবে না, এই ভাবিয়া মনে বেশ আনন্দ হইল। কিন্তু হরিষে বিষাদ। কনেকে ন্যাড়িতে চাড়িতে গিয়া দেখি, কাপড়ের ভিতর কণে নাই। তাহার বদলে কনের বোন্‌টা শুইয়া আছে। সে মাথায় ও অবয়বে অনেকটা কনের মত ছিল। নকল কনে ধরা পড়িয়া ঘর থেকে দৌড় দিল। আসল কনের জন্য সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রহিলাম কিন্তু তাঁর আর দেখাই পাইলাম না।

বের শিক্ষানবিশীর পর ছ'মাস চাকরীর শিক্ষানবিশীতে কাটিল। পরে যখন পাকাপাকি হাকিম হইলাম, তখন মা ও কনেকে নিকটে

আনিলাম। মা আশা করিয়াছিলেন যে বছর ফিরিতে না ফিরিতে তিনি পৌত্র মুখ দেখিবেন। তাহা হইল না। একদিন কথায় কথায় আক্ষেপ করিয়া বলিলেন যে বাসার গাছে কোন ফল ধরে না সেই সঙ্গে ইসারা করিলেন বউমারও ত' কোন ফল হয় না, গাছ পালার আর কি দোষ। কথাটা অতি কষ্টে বলিয়াছিলেন ও ভগবানের কানে নিশ্চয়ই সে কথা পৌছিয়াছিল। কারণ ইহার পরে ১৪।১৫ বৎসরের মধ্যে আমাদের ৫টি ছেলে ও ৪টি মেয়ে হইয়াছিল।

তখন একদিন মাকে বলিয়াছিলাম, বোধহয় আর তোমার কোন কষ্ট নাই। বউ তোমার এখন বেশ লায়েক হইয়াছেন। বছরে বছরে ফল দিতেছেন। তবে যে রকম rateএ progress করিতেছেন, তাহাতে শেষে কষ্টে পড়িতেও পারেন। মা এসব কথা মানিবার লোক ছিলেন না। তিনি এতগুলি নাতি নাত্নি লইয়া ব্যস্ত ও প্রফুল্ল থাকিতেন। কাহিল অবশ্য হইয়াছিলাম, আমরা দু'জনে। আমি মনে ও স্ত্রী শরীরে। নবম ও শেষ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর আমার স্ত্রীর শরীর একেবারে ভগ্ন হয়। ১৪।১৫ বৎসরে ৯টি ছেলে মেয়ের ধাক্কা সামলাইতে সুদীর্ঘ ২০।২২ বৎসর লাগিয়াছে।

যে সুখের জন্য বিবাহ করিয়াছিলাম, এখন তাহার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছি। আমাদের বন্ধন শিথিল হইয়াছে। গৃহিনী এখন নিজের ছেলে মেয়ে, নাতি নাত্নি লইয়া ব্যস্ত। আমার দিকে তাকাইবার তাঁর সময় নাই। তাঁর আদরের বদলে, ছেলে

মেয়ে বউমাদের ভালবাসা পাইয়াছি;—তা না পাইলে এ জীবন এতদিনে মরুভূমি হইত।

বেনারসী, ঢাকাই, শান্তিপুরী কাপড় এখন গৃহিণী ছাড়িয়াছেন। তসর, গরদ সার করিয়াছেন। এ মর্ত্ত্য জগতে স্বামীকে ভুলিয়া স্বর্গের স্বামীকে অন্বেষণে ঘুরিতেছেন। এখন আর রোম্যান্সের দিন নাই। যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও ব্যথা হৃদয়ে লইয়া বিবাহ বাসরে ঝাঁপ দিয়াছিলাম, তাহা কালের বক্র গতিতে আজ ভস্মীভুত। গৃহিণী এখন পাশ কাটাইয়া চলেন ও আমাকে দূরে রাখেন। কাছে আসেন না, পাছে তাঁহাকে ছুঁইয়া ফেলি। সহবাসের মুখে ছাই—গিন্নি থাকেন অন্দরে আমি থাকি তেপান্তর মাঠে। কি করিয়া যে পূর্ব্বের স্লব ভেস্তইয়া গেল, তাহা কেমন করিয়া বলিব ও বুঝাইব! একেই কি বলে কালের ধর্ম্ম?

আমাদের দাম্পত্য জীবনের ৪৩।৪৪ বৎসর কাটিয়াছে। বড় সাধ, ৫০ বৎসরে যেন একটি Jubilee করিয়া মরিতে পারি! ভগবান যেন সেইটুকু দয়া করেন, এই মিনতি করি। আমার তরুণ বন্ধুরা আমার এই—সেকেলে দাম্পত্য জীবনের সহিত তাঁদের রোম্যাণ্টিক ও আধুনিক দাম্পত্য জীবনের মিল না পাইয়া হয়ত—নাক সিট্‌কাইবেন, কিন্তু আমি জোর গলায় বলিতে পারি আমার তরুণ বন্ধুদের অপেক্ষা যে আমরা বিবাহিত জীবনে কম স্বপ্ন রাজ্য ও ভাবরাজ্য রচনা করিয়া ছিলাম—তা কখনই নয়।

গুলিখোরের দুর্গোৎসব

একদিন কল্‌কাতার বাগবাজারে বড় বড় গুলিখোরের আড্ডা ছিল। এখনও যে নাই তা নয়; তবে সেকালের মত নামজাদা নয়। সেকালে প্রত্যহ বড় বড় আড্ডাতে একটা না একটা কাণ্ড ঘটিতই। একবার দুর্গোৎসবের সময় গুলিখোরেরা মনে করিল যে দুর্গা পূজা করিতে হইবে। প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গেই resolution পাস্ হইয়া গেল।

প্রতিমা গড়িতে হইল না। গুলিখোরদের কাণ্ডই অদ্ভুত। সর্দ্দার গুলিখোর দুর্গা হইলেন, apprentice ছোঁড়ারা কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী আর দুটো new recruit সিংহ ও অসুর। গণেশের ইঁদুর ও কার্ত্তিকের ময়ুর রোগা পট্‌কা দুজনকে করা হইল। প্রতিমা খাড়া হইল। কেবল পাঁটা বলি বাকি। তখন একজন ছুটিয়া গিয়া একখানা খাঁড়া আনিল। রামধন দাদা দলের মধ্যে নিরীহ। সে পাঁটা হইয়া হাড়িকাটে তাহার গলা দিল যেমন দেওয়া, অমনি এক চোপ্। রামধন দাদার মুণ্ড ধড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। তখন মহা আনন্দে সকলে ঠাকুর বিসর্জ্জন করিতে গেল। বিসর্জ্জন হইবার পর, মা দুর্গা ও তাঁহার পুত্রকন্যাগণ সকলে গঙ্গার জলে ভাসিতে লাগিলেন। অর্থাৎ গুলিখোরেরা যাহারা এই সব সাজিয়াছিল, তাহারা মাথা জলের উপর রাখিয়া, চক্ষু বুজিয়া ঠাকুরের স্বপ্ন দেখিতেছিল। ইতিমধ্যে পুলিস রামধন দাদার অক্কা পাইবার সংবাদ পাইয়া লাসের অনুসন্ধানে গঙ্গাতে গিয়া

উপস্থিত। লাস তখন বহুদুরে ভাসিয়া চলিয়া গিয়াছে; কোথায়ও তাহার নিশান পাওয়া গেল না। যাহারা ঠাকুর সাজিয়া বিসর্জ্জনে জলমগ্ন ছিল, পুলিশ তাহাদের গলা ও হাত ধরিয়া টানাটানি সুরু করিল। অনেক টানাটানির পর গুলিখোরেরা বুঝিল যে পুলিশ রাংতা কুড়াইতে আসিয়াছে। তখন একজন বলিল, "শালা, রাংতা কুড়ুতে এসেছ, বাবা"। "এই নাও" বলিয়া পুলিশের টানাটানিতে জল হইতে সকলে উঠিয়া পড়িল। তখন পুলিশ সকলকে থানায় লইয়া গিয়া জামিনে ছাড়িয়া দিল। পরে খবর হইল সুরতালে তাহাদের সাক্ষ্য দিতে হইবে। গুলিখোরেরা ভাবিল এ আবার কি, সুর ও তালে সাক্ষ্য দিতে হইবে। অনেক গবেষণা করিয়া ঠিক করিল আচ্ছা তাই সই।

সকলে গুলি টানিতে টানিতে এই ঠিক করিল যে "জানি নি, শুনি নি, চিনি নি, আস্‌তো, যেতো, গুলি খেতো মাথা ত তার দেখি নি" এই গান গাইয়া বাজ্‌না বাজাইয়া সাক্ষ্য দেওয়া যাইবে।

* * * *

সাক্ষ্য দিবার জন্য পুলিশের ডাক আসিলে, সকল গুলিখোর হাকিমের নিকট উপস্থিত হইয়া বাজনা বাজাইয়া রামধন দাদাকে "জানি নি, শুনি নি, চিনি নি" বলিয়া সুর করিয়া তালে তালে গাইতে লাগিল। হাকিম ত অবাক্! "কি কর্‌বেন এদের সাক্ষ্য লইয়া! হৈ চৈ পড়িয়া গেল। এমন মজা কেউ কখন শোনে নাই, দেখে নাই। হাকিমের চক্ষু স্থির। অনেক বিবেচনার পর

পাগল বলিয়া ছাড়িয়া দিলেন। তখন গুলিখোরেরা আরও জোরে "জানি নি, শুনি নি, চিনি নি" গান গাইতে গাইতে বাহির হইয়া গেল। এমন গুলিখোরের মাথার তারিফ্ না করে থাকা যায় না। তা বলে এখনকার দিনে, এ কথা বলি না, যে লোকে গুলি খাইয়া মস্তিষ্ক সাফ্ করুক। একটা কথা অনেক দিন ধরিয়া আমার মস্তিষ্কের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারে। Archœologistর সঙ্গে গুলিখোরের কি কোন নিকট সম্বন্ধ আছে? একথাটা দেশের সুধীবৃন্দের নিকট পেশ করিলাম তাঁহারা রায় দিয়া বাধিত করিবেন।

পূজোর বাসি

সব জিনিসের সাজো ও বাসি আছে। কাহারও ভাগ্যে সাজো, কাহারও ভাগ্যে বাসি জোটে। আমার ভাগ্যে বাসিই হইল।

পূজার সময় কিছু লিখব মনে করেছিলাম, কিন্তু তা হয় নাই। এখন দেখ্‌ছি ভালই হইয়াছে। যে সব মহারথীরা এবার পূজোর আসরে নেমেছিলেন, তাঁদের সকলেই আমার চেয়ে সব বিষয়েই দিগ্‌গজ। নামিলে কিছুতেই থই পাইতাম না। সম্বৎসরের উত্তেজনা, আকাঙ্ক্ষা, সাধনা ও ভক্তি লইয়া লেখক লেখিকা কতই সব লিখিয়াছেন! সে সমস্ত এখন:পর্য্যন্তও উদরস্থ করিতে পারি নাই। শাস্ত্র পুরাণ মন্থন করিয়া অনেকে কত শত মুক্তা উঠাইয়াছেন তাহার হিসাব করা ভার। তাঁরা ধন্য। আমি তাঁদের চরণে দণ্ডবৎ হই।

একটা কথা বলিতে আমার ইচ্ছা হয়। পাঠক, মাপ করিবেন— কথাটা যদি ভাল না লাগে। সব কথা ত আর সকলের ভাল লাগে না; কাহারও কাহারও লাগিতে পারে। সেই আশায় লিখিলাম।

সে কথাটা আমার নিজের ধারণা। কোন বই-এ আছে কি না জানি না। যে রাজ্যে এখন পড়েছি তাতে বই টই বড় পাওয়া যায় না। ইচ্ছা করিলেও বইয়ের সাহায্য পাবার আশা নাই।

পুরা কালে কত শত যুগ আগে, তা ঠিক্ বল্‌তে পারছি না, রামচন্দ্রের স্ত্রী সীতা দেবীকে হরণ করেছিলেন রাক্ষস রাজা রাবণ।

অনেক লড়াইয়ের পর রাম যখন সীতাকে উদ্ধার করতে পারলেন না, তখন তিনি দেবীর আরাধনা ও পূজা সুরু করে দিলেন। দেবী খুসি হয়ে বর দিলেন। তখন রামচন্দ্র রাবণ বধ করে সীতার উদ্ধার করলেন। লোকে বলে আমাদের বাংলা দেশে শরৎকালে শক্তির পূজা সে অবধি চলে আসছে। আমি জানি না, এ প্রবাদ সত্য কি মিথ্যা। সে যাই হোক, এখন যে দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে শক্তির সাহায্য ভিন্ন কাহারও চলিতে পারে না। বিশেষতঃ এই বাংলা দেশে যে রকম নারী নির্য্যাতনের পালা পড়িয়াছে, তাহাতে আমার মনে হয়, শক্তি পূজা ভিন্ন অন্য পন্থাই নাই।

এখন আমাদের পূজার নৈবেদ্য বদলাইতে হইবে। চাল কলা ও মিষ্টির বদলে চোখের জল, শরীরের রক্ত ও আবশ্যক হইলে জীবন পর্য্যন্ত দিতে হইবে। তবেই মা সন্তুষ্ট হইবেন। আমরা স্বকৃত পাপে ও দুর্ব্ব্যবহারে মার কৃপা ও শক্তি হারাইয়াছি। আবার কোমর বাঁধিয়া লাগিতে হইবে। সামান্য চাল কলার নৈবেদ্যে মা খুসি হইবেন না। এখন পূজার রীতি বদলান দরকার। মাকে আরাধনা করিয়া আনিতে হইলে যে ব্যগ্রতা, ব্যাকুলতা, একাগ্রতা ও দীনতা চাই তাহার অভাব হইয়াছে। তাই মা আসিয়া আমাদের অবস্থা দেখিয়া দূরে পালান, নিকটে থাকেন না। তাঁহাকে ২৪ ঘণ্টা কাছে রাখিতে হইবে। কোন কোন স্থলে দেখি, দান, ধ্যান ও দরিদ্র নারায়ণের সেবার জন্য মা কিছুক্ষণ থাকেন। আবার শীঘ্র চলিয়া যান।

পূজোর বাসি

স্ত্রী জাতিই শক্তির আধার। সেই জাতির অবমাননা ও নির্য্যাতন যত দিন না বাংলার পুরুষেরা বন্ধ করিতে পারিবেন, তত দিন তাঁহারা মার কৃপা হইতে বঞ্চিত থাকিবেন এই আমার দৃঢ় ধারণা। এই গুণেই ইংরাজরা শক্তির বরপুত্র। "মা আনন্দময়ী আসিতেছেন" পূজার সময় এ কথা সকলেই বলেন। মার রূপ দেখিয়া মনে হয় না যে তিনি শরৎকালে আনন্দ লইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি তখন ভীমা রূপিনী, মহিষাসুর-মর্দ্দিনী হইয়া পাপের শাস্তি দিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। মা যে আনন্দময়ী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে তিনি কার্য্য বিশেষে কখন আনন্দময়ী কখন মহিষ-মর্দ্দিনী। স্ব স্ব জীবনে ও ভাবের বশে আমাদের প্রভেদ আকার হয়। এ কথা মনে করা চাই যে আমাদের ঘরে ঘরে "আনন্দময়ী মা" আছেন। চক্ষে দেখিয়াও দেখি না, কর্ণে শুনিয়াও শুনি না, হৃদয়ে আঘাত পাইয়াও অনুভব করি না। একি কম দুঃখের কথা! সেই আনন্দময়ী আমাদের স্ত্রী জাতিতে আছেন। তাঁহাদের পূজা ও সেবা করিলেই সেই "আনন্দময়ী মা"র পূজা ও সেবা হইবে। তাঁহাদের অবমাননা ও নির্য্যাতন বন্ধ হইলে আমরা পূজার প্রত্যক্ষ ফল পাইব। তাঁহাদের মর্য্যাদা ও গৌরব বাড়িলে আমাদের পূজা সার্থক হইবে।

এখন হইতে শক্তি পূজা এই ভাবে করিলে, দেশের ভাগ্য ফিরিবে। এই আমার ধারণা।

গবেষণা রহস্য

ভিন্ন ভিন্ন কালে মানবসমাজের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের তরঙ্গ উত্থিত হয়। তাই এই বিংশ-শতাব্দীতে বঙ্গদেশে গবেষণার বন্যা বহিয়াছে। গণ্য, মান্য, অগণ্য, নগণ্য, পণ্ডিত, মূর্খ সকলেই গবেষণায় উন্মত্ত। ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান ও চতুঃষষ্ঠি কলাবিদ্যাই গবেষণার বিষয়ীভূত হইয়াছে।

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া, আমার পুরাতন প্রেম জাগিয়া উঠিয়াছে। অনেকদিন হইতেই দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতেছি। কোন স্থানের ছিন্ন পুঁথি, কোন স্থানের স্মৃতি, কোন স্থানের শ্রুতি লইয়া সগর্ব্বে বসিয়া আছি। কখন বা গন্তব্য স্থানে যাইতে না পারিয়া, তাহার মানচিত্র দেখিয়া কল্পনার সাহায্যে সত্য মিথ্যা, আসল নকল অনেক ঘটনার অদ্ভুত টীকাটিপ্পনী লিখিয়া রাখিয়াছি। এতদ্ব্যতীত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্বল, কয়েকখানি জীর্ণ পুরাতন পুস্তক ও পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছি। ইহাদের কতকগুলি সংস্কৃত, কতক পালি, কতক আরবী, কতক ফার্সী—আর বাকী ইংরাজী। তরজমা ও স্বকপোল কল্পনা এখনও বাকী।

দর্শন বিজ্ঞানে আমার ইলম্ একটু কম। তাই সে দুটির মস্তকে এ পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করি নাই! ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বে আমার বেশ নাম ছিল। এখন কিন্তু অনেক শত্রু জুটিয়া আমার নাম ডুবাইয়াছে। সমাদ্দার, সরকার, মৈত্রেয় প্রভৃতির ন্যায় বিরাট

পুরুষগণ এই হতভাগ্য দেশের ঐতিহাসিক রহস্য সমূলে গ্রাস করিয়া মধ্যে মধ্যে উদ্গিরণ করিতেছেন। সেইজন্য আমার ভারি দুঃখ। কারণ বিবৃত করিতেছি।

জন্মকাল হইতেই ঐতিহাসিক কথা, পাঠ, সন্দর্ভ, রহস্য অর্থাৎ যত কিছু ইতিহাসের অন্তর্গত, সমস্তই আমাকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। শৈশবে ঠাকুরমার মুখে উপকথা না শুনিলে ঘুম হইত না। কৈশোরে মাতৃমুখ হইতে রামায়ণ ও মহাভারত না শুনিলে দিন কাটিত না। স্কুল কলেজে ইতিহাস পড়িতে পড়িতে তন্ময় হইয়া যাইতাম। প্রথম পৃষ্ঠা হইতে শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত, মুখস্থ করিয়াও তৃপ্তি হইত না। আরও কিছু নূতন তত্ত্ব পাইলে বোধ হয় উদরস্থ করিতাম। দুঃখের বিষয় আমার ভাগ্যে ঐতিহাসিক কৃতিত্ব লেখা নাই। ইতিহাস পড়িতে কোন ত্রুটি করি নাই। বঙ্গদেশ হইতে সুরু করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ, গ্রীস, রোম, ইংলণ্ড —এমন কি পৃথিবীর ইতিহাস পর্য্যন্ত—অধ্যয়ন করিয়া ফেলিয়াছিলাম! ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়িয়া একমাসকাল কাঁদিয়াছিলাম—দুঃখে, অপমানে ও লজ্জায়। এককালে আমরা কি ধনুর্দ্ধরই ছিলাম! এখন স্বকৃত পাপে আমাদের কি অধঃপতনই হইয়াছে। আবার ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়িয়া এত আহ্লাদ হইয়াছিল যে, আহার নিদ্রা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। একটি সামান্য সর্ষপ পরিমাণ বীজ হইতে যেমন এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ এই ক্ষুদ্র দ্বীপবাসী চরিত্রবলে কত বড় হইয়াছেন। এই সমস্ত বিদ্যা জাহির করাতে 'কেলাসে'র ছেলেরা বলিয়াছিল যে আমি

পরে একজন 'কেষ্ট বিষ্ণু' হইব। পরীক্ষার সময়ে কিন্তু বিত্তাবুদ্ধির দৌড় দেখাইতে পারি নাই। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইতিহাসের দিন জ্বর করিয়া বসিয়া রহিলাম এফ-এ পরীক্ষায় ইতিহাস ইচ্ছাধীন ছিল। সুতরাং ইহার পরীক্ষা দিতেই ইচ্ছা হইল না। বি-এ পরীক্ষার জন্য দেড় বৎসর ইতিহাস লইয়া নাড়াচাড়া করিলাম, অন্তিমকালে কিন্তু উহা ছাড়িয়া দিয়া বাঁচিলাম। ইতিহাসে এম-এ দিব মনে করিতে করিতে লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়া চাকুরিতে ঢুকিয়া পড়িলাম। সে আজ ২৫ বৎসরের কথা। সত্যের খাতিরে বলিতে হয় যে, এই সুদীর্ঘকালের ভিতর একদিনও ইতিহাসকে ভুলিতে পারি নাই। শয়নে স্বপনে ও জাগরণে ইতিহাসের কথা অহরহ মনে পড়িয়াছে। মাসিক পত্রিকা ও রিভিউতে যে সমস্ত ঐতিহাসিক গবেষণা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত, তাহার অধিকাংশই আমার নজরে পড়িত। 'হিষ্টরিয়ানস্ হিষ্টরি অব দি ওয়ার্ল্ড' কিনিয়া শিয়রে রাখিয়া শয়ন করিয়াছি। ভয়ে ও দুঃখে কোন 'ভলুম' এপর্য্যন্ত খুলি নাই—পাতা পর্য্যন্ত কাটি নাই—পাছে আবার স্বদেশের দুর্ণাম পরের মুখে শুনিতে হয়। ইতিহাসের জন্য স্মরণ-শক্তির পদে ভীষণ কুঠারাঘাত করিয়াছি। নোট লিখিতে লিখিতে কানে কলম গুঁজিয়া এমন আত্মহারা হইয়াছি যে, কলমের জন্য ডেস্ক, বাক্স, তক্তাপোষ, চেয়ার, টেবিল, আলমারি তোলপাড় করিয়াছি। মোট কথা ইতিহাস আমাকে ছাড়ে নাই, পাইয়া বসিয়াছে। আমিও ইতিহাস ছাড়িতে পারি নাই। যে বিষয়ে যার মন মুগ্ধ হয়, তাহারই এই দশা হয়। আমাদের 'হরু' ভায়া ও

তাঁহার খোকার মা এত ধাক্কা খাইয়াও সাহিত্যসেবা ছাড়িতে পারেন নাই। কারণ, সাহিত্য তাঁহাদের অস্থিমজ্জাগত। মজুমদার মশাই ও তাঁহার গৃহিণী এই দ্বিতীয় কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের সময়ও হাসি-ঠাট্টার গবেষণা ভুলিতে পারেন নাই। তাই মনে হয় যে, সেইরূপ ইতিহাস আমার সহিত চিতায় উঠিয়া সহমরণে যাইবে। ইতিহাসে ষোলকলা বিদ্যা হইয়াছিল। বাকি ছিল কেবল অভিনয় ও নাম। তাহা আর শত্রুদের জ্বালায় হইল না!

ইতিহাসের শ্রাদ্ধ করিয়া প্রত্নতত্ত্বে হাত দিয়াছিলাম। এ জিনিষটা ইতিহাসের অনেক উপর। শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি উপাধি ধারী ব্যতীত কেহ বড় ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন না। ইহার আদি অন্ত ও মধ্য ইতিহাসে নাই। শ্রুতি, স্মৃতির ইহার উপর প্রভুত্ব বড় খাটে না। ভূগর্ভে, পর্ব্বতশৃঙ্গে, গিরি-গুহায়, সমুদ্রের অতল জলে ইহার বাস। তাম্র-শাসন প্রভৃতির হিজিবিজি লেখা ও রেখাপাত ইহার নাড়ী নক্ষত্র। দেবদেবীর, ভূতপ্রেতের অবয়ব-খোদিত ইষ্টক, কাষ্ঠ, প্রস্তর ও অষ্টধাতু নির্ম্মিত পুরাতন মুদ্রা ইহার প্রাণ। অনেক অভিধানে ইহার নাম গন্ধ নাই—তাই এত লম্বা চওড়া ব্যাখ্যা। আমার কপালে যে ক'খানি ইট, কাঠ ও পাথর পড়িয়াছে, তাহার মধ্যে কোনটি সত্যযুগের কোনটি দ্বাপরের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য-দান করিতেছে! আবার কোনটির ভিতর দিয়া কলির আদি ও মধ্য উঁকি মারিতেছে। অন্ত এখনও দূরে—নজরে আসিতেছে না তবে আশা হয় যে আমাদের প্র-প্রপৌত্রেরা কলির লয় দেখিয়া সুখী

হইবে। প্রত্নতত্ত্বে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই বুঝিতে পারিলাম পুরাতন চাউল যেমন রুগ্ন শরীরের খাদ্য, পুরাতন চর্চ্চা তেমনি রুগ্ন মনের ভোগ্য। ক্রমশঃ পুরাতন আমার সনাতন পথ্য হইয়া দাঁড়াইল। নূতনে বীতস্পৃহ হইলাম!

এখন পুরাতন চাউল না হইলে পোড়া মুখে রোচে না। সেকালের পোষাক না হইলে বস্ত্র পরিতে ইচ্ছা হয় না। পুরাণো আদব কায়দা না দেখিলে চটিয়া মরি। প্রবীণা গিন্নী না হইলে ঘরে মন বসে না। বাল্মীকির রামায়ণ, ব্যাসদেবের মহাভারত, কালিদাসের শকুন্তলা না পড়িলে সুখ পাই না। বেদ, গীতা ও পুরাণের ধর্ম্মকথা না শুনিলে মনে শান্তি হয় না। শেষে দেখি, সেকাল আর একাল উভয়ের তুলনাই হয় না। রামের মত রাজা, লক্ষ্মণের মত ভাই, সীতার মত পত্নী, সেকালেই ছিল, একালে তাঁহাদের কঙ্কালও মেলা ভার। রামায়নের হনুমান পরোপকার করিত, এখনকার দলের হনুমান পরদ্রব্য হরণ করে, আর কিছু বলিলে দন্তবিকাশ পূর্ব্বক হাসে ও চড় মারে। তখনকার ছেলেরা, খাইয়া পরিয়া মানুষ হইত, দেশের লোকের আদর্শে। মানুষে মানুষে ভাব ছিল। দুজনে একত্র হইলে কামড়াকামড়ি করিত না। মানুষ কর্ম্ম করিত দেশের জন্য, লোকের জন্য, ধর্ম্মের জন্য; নামের জন্য লালায়িত ছিল না। এখন তাহার বিপরীত। সব কাযেই গল্‌তি। আওয়াজে লোক অস্থির, আসলে ফাঁকি। এখন আমরা দুর্ব্বলের দারোগা, সবলের বলির পাঁঠা। প্রতিবেশীর শত্রু, স্বদেশের মিত্র। আমরা ধনীর মাথায় ছত্র ধরি, নির্ধনের মাথায়

লাথি মারি। সত্যের আদর করি না, মিথ্যার পসার দেখিয়া তাহার সহিত যোগ দিই।

হাকিমেরা বলেন, সব শালাই চোর। উকিলেরা বলেন, সকলেই সাধু। অর্থী প্রত্যর্থী দুজনেই তামা তুলসী ও গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া বলেন, তাঁহাদের প্রত্যেক কথাই সত্য। ডাক্তার, বৈদ্য বলেন, রোগীরা কথা শুনে না, তাই ম্যালেরিয়া কলেরা ও প্লেগে দেশ ছারখার করিতেছে। রোগীরা বলেন, ডাক্তারেরা পড়েন না শোনেন না, গবেষণা করেন না, তাই ঔষধ খুঁজিয়া পান না; আর বোধ হয় পেটে অন্ন না থাকিলে সব ব্যাধিই চাপিয়া ধরে। রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন, স্বায়ত্ত শাসন এই ভবনদী পারের খেয়া ও সকল সুখের আকর। সাধারণ লোকে বলে, সেটা শুদ্ধ ১০।১৫ জন নেতাদের জন্য। কে না জানে যে সংবাদ-পত্রের উত্তেজনা ও সরকারের সদিচ্ছা স্বত্বেও, আমরা যে তিমিরে আছি সেই তিমিরেই থাকিব—যদি আমাদের আত্মসংযম, আত্ম-নির্ভরতা, আত্মত্যাগ ও বিষয়বুদ্ধির মাত্রাটার একটু বৃদ্ধি ও আত্ম-শ্লাঘার মাত্রাটার একটু হ্রাস না হয়। যুদ্ধ না করিয়াই আমাদের ছেলেরা যোদ্ধা। কাজেই আমরা যোদ্ধার বাপ। সেইজন্য দাসত্ব শৃঙ্খল দূরে ফেলিয়া, মনে মনে লঙ্কাভাগ করি। আর মধ্যে মধ্যে 'পোষ্টওয়ার রিফরম'এর স্বপ্ন দেখি! এরূপ আত্মপ্রসাদ অতি অল্প জাতির ভাগ্যেই ঘটে!

আমরা এখন সকলেই স্বল্পবিত্তর স্বদেশ প্রেমিক, কিন্তু স্বদেশী ভাবে খাইতে, বসিতে, শুইতে কাপড় পরিতে, কথা কহিতে,

আলাপ ও অভ্যর্থনা করিতে বড়ই নারাজ। স্বদেশেরও প্রাণ আছে। সে প্রাণ লোকের খাওয়া পরা, শোয়া বসা, লেখাপড়া, আলাপ পরিচয়, গান বাজনা এবং পিতা মাতা, ভগিনী পত্নী, পুত্র কন্যা ও বন্ধু বান্ধবের সহিত ব্যবহার হইতে যত ধরা পড়ে, আর কিছুতেই তত বোঝা যায় না। বঙ্গের বাহিরে বোধ হয় এখনও সর্ব্বত্র এই নিয়ম জারি। জাতীয় জীবনের ছায়া লোকের নিত্য-নৈমিত্তিক ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও লেখাপড়ার মধ্য হইতে যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্বদেশী ও বিদেশী উভয়েই সন্দিহান্ হন। সেই জন্য আমাদের দুর্ণাম দেশ-বিদেশে রাষ্ট্র। বিলাতে না গিয়া, তাহার নাম শুনিয়া ও এখানকার সাহেবদের সুমিষ্ট পদাঘাত খাইয়াই আমরা সাহেব সাজি এবং মনে মনে কত সুখ অনুভব করি। আমরা মেকি-সাহেব অথবা বাঙ্গালী, সে বিষয়ে অনেকের সন্দেহ হয়। আমরা কাজের মধ্যে শিখিয়াছি, উত্তম নকলনবিশী। একজনের কথায় উঠি, একজনের কথায় বসি, আর একজনের কথায় শুই। নিজের বুদ্ধি-শুদ্ধি বড় বেশী খরচ করি না। কারণ, সেটা পরকালের জন্য সঞ্চয় করি। অনুকরণ এখন আমাদের মস্তক হৃদয় ও মেরুদণ্ড ভেদ করিয়া গাড়িয়া বসিয়াছে। চিন্তার মধ্যে নকল ছাড়া বড় কিছু আসে না। কেহ জুতার দোকান খুলিয়া দিয়া, কেহ বক্তৃতা করিয়া, কেহ দুছত্র বাঙ্গালা লিখিয়া, কেহ 'অমৃতবাজার' ও 'বেঙ্গলী' পড়িয়া, কেহ বা সান্ধ্য সমিতিতে ধুতি চাদর পরিয়া, কেহ বা বিবাহের আসরে হাঁটু গাড়িয়া ও কলার পাতে লুচি ছক্কা

খাইয়া স্বদেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন, আর জয়ঢক্কা বাজাইতেছেন। তাঁহার ঘরে যাও, বসো, আলাপ কর, দেখিবে তুমিও যেরূপ ঘোর প্রেমিক, তিনিও তদ্রূপ—বরং এককাঠি বেশী। একেবারে খিচুড়ি! প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, আর্য্য ও অনার্য্য, দেব ও দানব, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষ, নর ও কিন্নরের অপূর্ব্ব সমবায়, যাকে বলে (ডি এল রায়ের) "Queer amalgam"। নৃসিংহ ও গণেশ ঠাকুরের মডার্ণ অবতার। সমস্তই ভক্ষণ করিয়া বসিয়া আছেন, কিন্তু কোনটিই হজম করিতে পারেন নাই। "মানুষ আমরা নহি ত মেষ" ইহা কবির কল্পনা। বাস্তব জগতে আমরা মানুষও নহি মেষও নহি, আমরা উভয়ের মধ্যে আছি। প্রায় এক শতাব্দী-কালের উচ্চ সভ্যতার সঙ্ঘর্ষে আমরা এই মধ্য স্থলে আসিয়া পৌছিয়াছি, এইটুকুমাত্রই লাভ করিয়াছি। কোন বিষয়ে ভগবানের কৃপায় কিম্বা সরকারের সাহায্যে যদি এক ইঞ্চি উঠি ত অন্য দিকে নিজের গুণে দুই ইঞ্চি নাবি। লেখাপড়ার গুণেই হউক বা সভ্যতার সঙ্ঘর্ষেই হউক, হাতে বহরে ও মুখে আমরা বেশ বাড়িতেছি। হৃদয় ও প্রাণ কিন্তু হারাইয়াছি। অনেক যুগের যোগ বিয়োগের ফলে স্বর্গ হইতে তাড়িত হইয়া মর্ত্ত্যে আসিয়াছিলাম, এখন আবার অতল পাতালে ডুবিতেছি। হা ভগবান, তুমি কি আমাদের একটুও হিতাহিতজ্ঞান, যথাযথবোধ—যাকে বলে sense of proportion—দাও নাই? জষ্টিস্ সার আশুতোষ মুখার্জ্জি ও ডাক্তার পি, সি, রায় প্রভৃতির মত কয়েকবিন্দু জলে এ প্রকাণ্ড বঙ্গোপসাগরের উদর পূরিবে না। আরও অনেক বিন্দু চাই।

এ জীবনটা কেবল নিজ চর্চ্চা লইয়া নষ্ট করি নাই। সুবিধা পাইলেই পরচর্চ্চা করিয়াছি। কিছু অভিজ্ঞতাও লাভ করিয়াছি। এখন স্বভাবটা এমন করিয়া তুলিয়াছি যে, পরের ভালমন্দ না শুনিলে দিনে অন্ন রুচে না, রাত্রে নিদ্রা হয় না।

যে স্থানে আমি বিরাজ করিতেছি, তাহার আশে পাশে অনেক রকমের গবেষণা হয়। বিদ্যা, বুদ্ধি, বিক্রমে স্থানটি 'বিক্রমপুর' বলিলে অত্যুক্তি হয় না। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই সুশিক্ষিত ও উচ্চ সভ্যতা সঙ্ঘর্ষিত। পুরুষেরা প্রকাশ্য আড্ডাতে এবং স্ত্রীলোকেরা পর্দ্দার অন্তরালে হাবেলির ভিতর গবেষণা কার্য্য সমাধা করেন। মর্দ্দানা আড্ডায় আমার গতিবিধি আছে। জেনানা মজলিসে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ, তবে আমি সংবাদ পাই।

একদিন পুরুষদের আড্ডায় গিয়া দেখি, গবেষণা ভীষণভাবে চলিতেছে। অনেকগুলি লোক সমবেত—প্রত্যেকেই স্বাধীন মতাবলম্বী। কেহ কাহাকে সমর্থন করিতে রাজী নহেন; হাতাহাতি বাকী—এমন সময় একদিন আমি প্রবেশ করিলাম। জনৈক অনিন্দ্য, সৌম্যমূর্ত্তি, সাহিত্যসেবী সভ্য নিঃশব্দে ও গুপ্তভাবে প্রকাশ করিলেন যে, উচ্চ সভ্যতার সঙ্ঘর্ষে বাঙ্গলী নিজস্ব হারাইতে বসিয়াছে। বিলাতফেরৎ দার্শনিক ভায়া অমনি বলিয়া উঠিলেন, "বাঙ্গালীর নিজস্ব বড় কিছু নাই, ছিল না। পরস্ব গ্রহণ করা তাহার পক্ষে আবশ্যক। যদি ইহাতে যৎকিঞ্চিৎ নিজস্ব যাহা আছে তাহার ক্ষয় হয়, তাহাতে কিছু আসে যায় না।" আসরে একজন চিত্রকর ছিলেন। তাম্রকূট সেবনজনিত মোহ কাটিয়া গেলে তিনি

বলিলেন, "রং ফলান অন্য হস্তে দিতে পারি, কিন্তু নিজের আউট-লাইন' ছাড়িতে পারি না।" প্রাণীবিৎ মহাশয় নাকে নস্য গুঁজিতে গুঁজিতে পশুর কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে দেখা যায়, পশুজগতে জাতি বর্ণ ও দেশ ভেদে হাতীতে, হাতীতে ঘোড়াতে ঘোড়াতে, গরুতে গরুতে অনেক প্রভেদ। তাহা না হইলে দেশী, আরব ও ওয়েলার একদরে বিক্রি হইত। সকলেই স্ব স্ব পার্থক্য বজায় রাখিয়া লোকের ও জগতের কার্য্য করিতেছে। মানুষের জন্য ভিন্ন বিধি বোধ হয় না।" দু একজন নূতন সভ্য বলিয়া উঠিলেন, "রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ এ সব কথা বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহা পড়িলে বুঝিতে পারিবে বাঙ্গালী কি চিজ্।" সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয় সম্ অপ্' করিয়া বলিলেন, "আসল কথাটা কেহই বোঝেন নাই। ভগবানের নববিধানে স্বাতন্ত্র্য ও ও পার্থক্য থাকিতে পারে না। সমন্বয় হইবেই হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ ও বনমানুষ সকলের একাকার হইবে।" সভাপতির মন্তব্য শুনিয়া সেস্থান হইতে পলায়ন করিলাম।

একদিন শুনি, জেনানা মজ্লিসে আর এক পালা হইয়া গিয়াছে। এক বিদূষী বলিয়াছেন, "স্ত্রীলোক জগজ্জননীর পরম আদরের ধন। প্রেম ও ভক্তির জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। স্ত্রীলোক যদি স্নেহবতী ও হৃদয়বতী না হইতেন, তাহা হইলে জগৎ চলিত না। সেই জন্য স্ত্রীলোকের শরীর ও মনের গঠন ও ভাব অন্যরূপ। পুরুষের মত নয়।" অপর এক মহিলা বলিয়াছেন, "এ সব কাযের

কথা নয়। পুরুষের বানান কথা। পুরুষের যদি স্ত্রীলোক ছাড়া একান্তই না চলে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিলেই হয়। এত ঘোর ফের কেন? আমরা স্বার্থপর নহি। পুরুষের সখী হইতে পারি, তবে আত্মসম্মান হারাইয়া দাসী হইতে পারি না।" সভাপত্নী বিদ্যা, বুদ্ধি, বেশ, ভূষা ও সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়া। এ সমস্ত কথার পর তিনি অকালে সভাভঙ্গ করিয়া গবেষণা বন্ধ করিলেন, আর বলিলেন, এখনকার কালে অসার কথার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। বিদুষী যাহা বলিলেন তাহা মানিতে হইলে আমাদের দফা রফা হইবে। কষ্ট, ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার পুঁটুলী অঞ্চলে বাঁধিয়া বৎসর বৎসর নূতন নূতন সন্তান পালন করিতে হইবে; ও অকালে জরা, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু চাপিয়া ধরিবে।" গবেষণার এই অকাল অবসানে অধিকাংশ মহিলা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তখন কেহ আপনার গহনার, কেহ আপনার শাড়ী ও জামার ব্যাখ্যানে মজ্‌লিস সরগরম করিয়া তুলিলেন। কেহ বা হাত পা ছড়াইয়া ফরাশ বিছানায় বসিয়া পান ও জর্দ্দার সৎকার করিলেন। পরে একে একে সকলে স্ব স্ব "কারাগারে" প্রত্যাগমন করিলেন।

স্ত্রীলোককে আমি বড় মান্য ও ভয় করি। মান্য করি তাঁর গুণের জন্য, ভয় করি তাঁর বচনের জন্য। ইঁহারা রাগিলে ঘর বাড়ী আকাশ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে—পুরুষ ত কোন ছার। কোন কোন কর্ত্তা যদি দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ জিজ্ঞাসা করেন, "হুজুরের মেজাজ আজ এত গরম কেন?" হুজুর অমনি বলিয়া উঠেন, "সপ্তাহে

ছয় দিন তোমরা গরম থাক, আর আমরা এক দিন গরম হইলেই নজর পড়ে !" ছয় দিন নরমের পর এক দিন গরম নিশ্চয় শরীর ও মনের পক্ষে উপকারী—তবে কর্ত্তারা তাহা বুঝিতে পারেন না। কারণ গিন্নী যে দিন গরম হইয়া পড়েন, সেদিন কর্ত্তার কপালে উপবাস জুটিয়া যায়। গরমের চোটে গিন্নী ডালে লবণ ও ঝোলে ফোড়ন দিতে ভুলিয়া যান ও একেবারে গবেষণায় মাতিয়া উঠেন। কাযেই কর্ত্তার খাওয়া হয় না।

এইভাবে বৎসরের পর বৎসর গবেষণা করি, দেখি, শুনি; নিজের ও পরের দশা ভাবি আর ঘরে বসিয়া কাঁদিয়া মরি। একদিন গিন্নীর নিকট ধরা পড়িয়া গেলাম। তিনি আমার সখের বই, পাঁজি পুথি, টীকাটিপ্পনী, ইট কাঠ, পাথর টানিয়া সমস্ত গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিলেন ও বলিলেন, "তুমি যে দেখি স্ত্রীপুত্র, আত্মীয় কুটুম্ব, অতিথি অভ্যাগত, প্রতিবেশী স্বজন সকলকে ভুলিয়া স্বদেশ-প্রেমিক হইয়া উঠিলে। নিজেকেও হারাইবে ও আমাদেরও মারিবে। স্বদেশপ্রেম যত সোজা মনে করিয়াছ, ওটা তত সোজা নয়। তোমার দ্বারা হবে না। এখন হইতে আমার হুকুম ছাড়া আর কোন প্রেমে মাতিও না।" কথাটি শুনিয়া আমি স্তম্ভিত। অনেকক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। কত অনুনয় বিনয় করিলাম। তিনি কিন্তু রুল অ্যাবসোলিউট্ করিলেন।

গৃহিণীর হস্তে অন্তিমে আমি বন্দী। তিনি এখন চোখে চোখে রাখেন। আশে পাশে সতত ঘোরেন ফেরেন। মুক্তবাতাসে

বসান। চাঁদের আলো দেখান, পাখীর গান ও নদীর কলকল ধ্বনি শোনান। মধ্যে মধ্যে গীতাও পড়ান। যদি এই এন্তেজাম্ আর কিছুদিন জারি থাকে, তবে ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ব ও স্বদেশপ্রেমের নেশা ছুটিয়া ভগবৎপ্রেমের উদয় হইবে, আশা করি। সেইজন্য গিন্নীর শরণাপন্ন। এখন আমার উপর তাঁহার একাধিপত্য!

ফাল্গুন, ১৩২৩ বাং

মধুরেণ সমাপয়েৎ